মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

এটাই ছিল আমার দ্বিতীয় গল্পের বই। দেরী করে বেরনোর ফলে হয়ে গেল তৃতীয়।

গল্পগুলো কোনো ধারাবাহিকতা মেনে সাজানো হয়নি। দশ বারো বছরে লেখা আর দশ বারো রকমের পত্র-পত্রিকায় বেরনো লেখাগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে দেওয়া এখানে।

তৃতীয় বই হলেও গল্পগুলো তৃতীয় শ্রেণীর নয়। আমি লিখে অন্তত টের পেয়েছি সেটা। প্রথম শ্রেণীর পাঠক যদি এ গল্পগুলোর দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বাদ পান, তাহলেই খুশি। প্রকাশক অবশ্য খুশি হবেন অধিক সংখ্যক পাঠককে তৃপ্তি জোগালে।

পূর্ণেন্দু পত্রী
সল্টলেক সিটি

টিনের বন্দুক

মণিকার সঙ্গে যে এ-ভাবে, এত বছর বাদে, এই রকম আতঙ্ক-জনক পরিবেশে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে, ভাবতে পারিনি।

আর জি করের খালের ধারে ফাঁকা বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়েছিলাম। কীভাবে বাড়ি ফেরা যাবে এই চিন্তায় দিশেহারা। সবে রাত্রি আটটা। অথচ সারা কলকাতায় মধ্যরাত্রির অন্ধকার। ট্রাম-বাস-ট্যাক্সী-ডাবলডেকার আর রাস্তার দু-পাশের দোকান-পাট থেকে প্রেতচক্ষুর মত অস্পষ্ট আলোর ইশারা এখনো রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে বলেই কলকাতাকে চেনা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমার কৈশোর কেটেছে শহর থেকে দূরে এমন এক নিরাপদ গ্রামের নির্জনে যার কোনখানে মহাযুদ্ধের উদ্যত থাবার আঁচড়ের দাগ পড়েনি এতটুকু, কেবল উদ্বাস্তু কলকাতাবাসীর বেপরোয়া পলায়নের উদ্যোগপর্বে বেশ কিছু লোক ছিটকে এসে আশ্রয় নিয়েছিল যার কোথাও কোথাও। ফলে ব্ল্যাক-আউটের এই কালিমাখা কলকাতার সঙ্গে আজ যৌবনেই এই প্রথম শুভদৃষ্টি।

মাথার উপর দিয়ে একটা বিমান উড়ে গেল প্রমত্ত শব্দে পায়ের তলায় মাটি কাঁপিয়ে। থরথরিয়ে উঠল বুকের ভেতরটা। আবার হয়তো কলকাতা ছেড়ে পালাতে হবে। ভীষণ অসহায় বোধ করছি যাত্রী হিসেবে এই বিরাট শূন্যতার ভিতরে একা দাঁড়িয়ে থাকতে। আগে কোনদিন এমন স্পষ্টভাবে চোখে পড়েনি, এই খালের ধারে, যেখানে প্রায় ছ-সাত বছর ধরে বাসে উঠছি, বাস থেকে নামছি, এতগুলো গাছ ছিল সারি সারি। একমাথা অন্ধকার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি যেন দেখতে পেলাম আমার মনের বিপদগ্রস্ত অনুভূতিরই একটা চিত্ররূপ। পায়ের তলায় খস্‌খস্‌ করে কি যেন নড়ে উঠল। কাগজ। ছেঁড়া কাগজের

টুকরো। আজ বিকেলের টেলিগ্রাম। আমিও কিনেছিলাম একটা। কোথায় যেন ফেলে এসেছি। লাহোর খণ্ডে আমাদের জওয়ানেরা বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে শত্রুব্যূহ ভেদ করে।

যুদ্ধকে আমি ঘৃণা করি। হয়তো ভীরু, তাই। হয়তো ভীরু বলেই শান্তিপ্রিয়। তবুও চারপাশে এত অন্ধকার, উদ্বেগ, আশঙ্কা সত্ত্বেও যুদ্ধকে আজ বেশ ভাল লাগছে—বিকেলের টেলিগ্রামটা হাতে পাওয়ার পর থেকে। যেহেতু আমরা জিতছি। আমরা মানে ভারতবর্ষ। কিন্তু সেটা ভোগ করতে পারছি না তারিয়ে। বুকে চেপে বসেছে উদ্বেগ। বাড়ি ফিরবো কিভাবে? শেষ বাস চলে গেছে। আমি খেয়াল করিনি যে আজ থেকে রাত আটটার পর এখানে সমস্ত বাস চলাচল বন্ধ। ডাহা মূর্খের মত কাজ। এই আঁধার-সংকুল রাতে অত দূর পথ হেঁটে যাওয়ার কথাও চিন্তা করা যায় না। ট্যাক্সীর পয়সা নেই। তা ছাড়া ট্যাক্সী কি যাবে? আগে যখন অবস্থা স্বাভাবিক ছিল, শেয়ারের ট্যাক্সী পাওয়া যেতো। কিন্তু এখন—

ঠিক এই সময়ে আমার নাম ধরে মহিলা কণ্ঠে কেউ যে ডাকবে আশা করিনি। তাকিয়ে দেখি মণিকা। অমন অন্ধকারেও একবারের তাকানোয় মণিকাকে যে দেখা গেল, এটাই আশ্চর্য। অথবা মণিকা বলেই ঘটতে পারল অমন আশ্চর্য।

—মণিকা! তুমি!

—শেষ বাসটা চলে গেছে, না?

মণিকার কণ্ঠস্বরে তার বিপন্নতা।

—হ্যাঁ।

—ঈস্।

—কেন, তুমি কোথায় যাবে?

—বারাসতের কাছে—

—সে কি! তুমি—তোমরা ওদিকে থাক নাকি? কতদিন?

—বছর দেড়েক হবে।

—বারাসত কলেজে গেছো নাকি ?

—হ্যাঁ।

—প্রদীপ্ত ? প্রদীপ্তও কি ওখানে ?

মণিকা জবাব দিল না। যেন শুনতেই পায়নি প্রশ্নটা।

মণিকা স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না এক জায়গায়।

—তুমিও তো ঐদিকে যাবে ?

আমার দিকে তাকিয়ে তার প্রশ্ন।

—হ্যাঁ। আমারও তো একই অবস্থা। ব্যাপারটা খেয়াল করিনি—

—আমি জানতাম। কিন্তু আসতে পারলাম না। গাড়িগুলোর যেন স্পীড নেই একদম। গরুর গাড়ির মত ঢিকির-ঢিকির করে এগোচ্ছে। ভবানীপুর থেকে শ্যামবাজার এল প্রায় দেড় ঘন্টায়।

—জেনে-শুনে আজকেই ভবানীপুরে যেতে গেলে কেন ?

—খুব জরুরী দরকার না থাকলে নিশ্চয়ই যেতাম না। এখন কি করে বাড়ি ফেরা যায়, একটা ব্যবস্থা কর শ্যামল। তোমাকে দেখে তবু খানিকটা ভরসা এল! উঃ, কী চেহারা হয়েছে কলকাতার! শ্যামল! দাঁড়িয়ে আছ কেন, দেখ না, একটা ট্যাক্সী পাওয়া যায় কিনা—

মণিকার গলায় আতঙ্ক, বেদনা ও ক্লান্তি। ব্ল্যাক-আউটের কালো কলকাতা দেখে ভয় পেয়েছে মণিকা। অন্ধকারেও মণিকাকে যতটা দেখা যায় দেখে নিতে লোভ হল। মণিকাকে শেষ দেখেছি—সে বোধ হয় বছর তিন-চার আগে। মেট্রোর সামনে দেখা হয়েছিল। বিয়ের পর ওদের দুজনকে সেই প্রথম দেখা। প্রদীপ্ত কাফে-ডি-মণিকোয় টেনে নিয়ে গেল। খাওয়াল খুব। সেদিন বড্ড খুকী খুকী লেগেছিল মণিকাকে। অত্যুজ্জ্বল আবরণ-আভরণের জেল্লায় যেন ঢাকা পড়েছিল আসল মণিকা। আজ কিন্তু সে মণিকাকে

দেখছি না। খুবই সহজ সরল অনাড়ম্বর। যা ওকে মানায়। ইউনিভার্সিটি-র ছেলে-মাতানো দস্যি মেয়ে মণিকাকে আজ এই মুহূর্তে বিপন্ন দেখতে বেশ ভালই লাগছে। বিপন্ন না হলে মণিকা অত মিষ্টি সুরে কি শ্যামল বলে ডাকতো? মণিকার গলায় আমার নাম এত মিষ্টি সুরে অনেক বছর পরে শুনলাম। এই রকম নির্জন অন্ধকার পরিবেশে এই রকম অন্তরঙ্গ সম্ভাষণ এক ধরনের বিষাদকে ধূপের মত জ্বালিয়ে দেয়।

মণিকার দিকে তাকালাম। মণিকাও আমার দিকে। অন্ধকারেও নক্ষত্র, এই রকমই চোখ তার। বিপন্ন বিষণ্ণ হয়ে আছে বলে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। যেন কলকাতার অন্ধকার ওর চোখের চারপাশে কাজল এঁকে দিয়েছে। আমি মৃদু একটু হেসে বললাম

—এতেই এতো ভয় পাচ্ছ? সবে তো কলির সন্ধ্যে। যুদ্ধের কোথায় কি? কল্‌কাতা সবে কালো হয়েছে। আস্তে আস্তে নীল হবে, লাল হবে।

মণিকা চোখ দুটো নামিয়ে নিল। করুণ আর মৃদু বিলাপের মত স্বরে সে বললে

—তোমাদের যুদ্ধ হয়তো এখনও শুরু হয়নি। কিন্তু আমার যুদ্ধ অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। এখন এ-সব কথা ভাল লাগছে না শ্যামল। প্লীজ দেখ। একটা ট্যাক্সী পাওয়া যায় কিনা। আমি মা হয়েছি জান? জান না? বাড়িতে আমার একটা বাচ্চা ছেলে আছে। তিন বছরের। বুঝতে পারছো?

—আর একটা বুড়ো ছেলেও তো আছে বাড়িতে? ছত্রিশ বছরের?

মণিকা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সহসা।

—আমাকে দেখে তোমার বোধহয় খুব ছ্যাবলামি করতে ইচ্ছে করছে? তোমার যদি অসুবিধা হয় আমিই না হয় ট্যাক্সীটা ডাকছি—তুমি দয়া করে আমার এই প্যাকেটটা একটু ধরবে?

এইহচ্ছে, আমাদের সেই ইউনিভার্সিটি-যুগের নায়িকা মণিকার কণ্ঠস্বর। ওর তীক্ষ্ম ঋজু ধারালো যৌবনের আকর্ষণে যারা চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরতো, তাদের লোলুপ লুব্ধতাকে দাবিয়ে রাখার ঐ একটি মারাত্মক অস্ত্র কণ্ঠায়ত্ত ছিল মণিকার—ওর তীক্ষ্ম, ঋজু, ধারালো কণ্ঠস্বর।

—দাও, প্যাকেটটা দাও। ট্যাক্সী ডাকছি। পুজোর মার্কেটিং নাকি?

—না। প্রেজেণ্টেশান। রবিবার মিণ্টুর জন্মদিন। কাকীমা দিলেন।

২

ভেবেছিলাম গাড়িতে ওঠার পর মণিকা হালকা হবে। মণিকার সঙ্গে কথা বলা যাবে হালকা হয়ে। কিন্তু মণিকা যেন আরও গম্ভীর। একদৃষ্টে তাকিয়ে বাইরের সীমাহীন অন্ধকারের দিকে। মাঝে মাঝে দু-একটা লরীর আলোয় গাড়ির বাইরের অন্ধকার ও গাড়ির ভিতরের মণিকা ঝলসে উঠেছিল। ঐ চকিত আলোয় মণিকার ঈষৎ বেঁকে বসে থাকার ভঙ্গীটি ফুটে উঠেছিল মায়াময় হয়ে। বাইরে বাতাস। দু-এক গোছা বাঁকা চুল কপালের চারপাশে উড়ছে। পিঠের বেণীটাকে কাঁধের পাশ দিয়ে টেনে বুকের দিকে। অনাবৃত মসৃণ ঘাড়। ঐ ঘাড়েই মণিকা রাজহংসী।

এই সেই মণিকা যাকে নিয়ে কত ঠাট্টা, ইয়ার্কি, ছড়া-কাটা, ছড়া লিখে রাখা ব্ল্যাক-বোর্ডে। সকলেরই আকর্ষণ ছিল মণিকার দিকে। আমারও ছিল। কিন্তু মণিকার আকর্ষণ ছিল কলেজের এক অধ্যাপকের প্রতি। অকারণে সেই অধ্যাপক আমাদের কাছ থেকে বিদ্রূপ ও অপমান পেয়েছেন কতদিন। কলেজের দিন ফুরলো। এল

ইউনিভার্সিটি। সেই সঙ্গে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের বেশে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটল প্রদীপ্তর। সে এল, তাকাল, এবং জয় করল মণিকাকে। আলেকজাণ্ডারই বটে। বাঙালীর ছেলের সচরাচর ঐ রকম পুরুষাকৃতি চেহারা হয় না। সুদর্শন ও সুগঠনের যুগলমিলন যেন। প্রদীপ্তকে দেখার পর সত্যিই আমাদের লজ্জা করতো নিজেদের হাড়িগিলে মার্কা চেহারার দিকে তাকাতে। আর প্রদীপ্তর মত ছেলে যেখানে মণিকার প্রেমপ্রার্থী সেখানে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না আর। আমাদের রসবোধ ছিল, তাই সাকসেসফুল রিট্রিটে লজ্জিত হইনি। উল্টে আমরা সহায়তা-সহযোগিতা করেছি যাতে প্রদীপ্ত আমাদের ছাত্রদলের পাণ্ডা হয়ে ওঠে। প্রদীপ্তর মধ্যে ব্যক্তিত্ব ছিল পাণ্ডা হওয়ার।

অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছে ট্যাক্সীটা। আর একটু পরেই আমি গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাব। কত বছর পরে মণিকাকে এত কাছে পাওয়া গেল। কোন কথা হবে না? কি এত ভাবছে ও। ছেলের কথা? দেরী করে ফেরার জন্যে প্রদীপ্ত অভিমান-মেশানো রাগের কপট-অভিনয় করলে তাকে কিভাবে সংহত করবে? ধাক্কা দিয়ে খুলে দিলাম আমাদের দুজনের মাঝখানে বন্ধ-হয়ে-থাকা স্তব্ধতার দরজাটা।

একটু মোটা হয়েছে মণিকা। সুখী জীবনের লক্ষণ।

মণিকা যেন পাথরের স্ট্যাচু।

—তুমি কি কথা বলবে না মণিকা?

একটু নড়ে-চড়ে বসল। কিন্তু আমার দিকে তাকাল না।

—কি বলবো বল?

—সেটাও কি আমি বলে দেবো? কত বছর পরে দেখা হচ্ছে। কিছুই কি বলার নেই?

—তুমি বিয়ে করেছ?

—ওসব কথা বাদ দাও। করেছি। প্রদীপ্তর কথা বল। তোমাদের দাম্পত্য-জীবনের খবরাখবর বল। আচ্ছা, একবার শুনেছিলাম প্রদীপ্ত ডি-ফিলের জন্যে চেষ্টা করছে—সত্যি!

—হ্যাঁ। চেষ্টা করেছিল এবং পেয়েওছে।

—বাঃ, গুড নিউজ। ভেরী গুড। তোমরা দুজনেই একই কলেজে আছ নাকি?

—না।

—তা হলে? প্রদীপ্ত কোন্ কলেজে?

—কোন কলেজেই নয়। জম্মুতে।

—জম্মু? তার মানে?

—চাইনিজ অ্যাগ্রেশানের সময় ও আর্মিতে যোগ দিয়েছিল।

—কি বলছো তুমি? সত্যি?

—তোমার কি মনে হচ্ছে মিথ্যে বলছি?

এ কি বলছো মণিকা? প্রদীপ্ত যুদ্ধের সৈনিক? মণিকার মত রূপসী স্ত্রী, তিন বছরের শিশুপুত্র, অধ্যাপকের নিরাপদ চাকরি ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে? প্রদীপ্তর শরীরে সৈনিক হওয়ার মত শক্তি ছিল—অনস্বীকার্য। কিন্তু জীবনের সুখশয্যার প্রতি এতটা মমতাহীন হওয়ার মত সাহস ছিল—অভাবিত।

বুঝতে পারলাম মণিকার স্তব্ধ অন্যমনস্কতার কারণ। বুঝতে পারলাম কী গভীর উদ্বেগ, আশংকা ও শূন্যতার উপলব্ধি থেকে মণিকা একটু আগে বলেছিল—তোমাদের যুদ্ধ হয়তো এখনও শুরু হয়নি, কিন্তু আমার যুদ্ধ অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। আরও কিছু বল মণিকা। প্রদীপ্তর গল্প বল। সে কবে গেল। কিভাবে গেল। কি কথা বলে গেল। তার শেষ চিঠি পেয়েছ কবে। কি লিখেছে সে। কেমন লাগছে তার যুদ্ধক্ষেত্রের গোলা-বারুদ, কামান-বিমান, অন্ধকার-আতঙ্ক। বল মণিকা। প্রদীপ্ত আমাদের বন্ধু। বড় জানতে ইচ্ছে করছে।

কিন্তু মণিকাকে আমার মনের এই আলোড়ন জানাতে পারলুম না। পার হয়ে গেল আরও কিছু স্তব্ধ সময়।

—ভবানীপুরে কি প্রদীপ্তের কোন খোঁজ নিতে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—কে থাকেন?

—কাকীমার বাড়ি। কাকাবাবু চণ্ডীগড়ের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ।

—কিছু খবর পেলে?

—না। নতুন কোন চিঠি দেননি কাকাবাবু।

এই সময় ওকে সাহস ও সান্ত্বনা দেওয়া প্রয়োজন।

—তবে জানতো ভয়ের কিছু নেই। আজকের টেলিগ্রামে বলেছে যুদ্ধে আমাদের পজিশনই বেটার। জম্মু-র অবস্থা ভাল। নিশ্চয়ই চিঠি আসবে দু-একদিনের মধ্যে।

প্রদীপ্তর মুখটা মনে করতে চেষ্টা করলাম বার বার। আশ্চর্য, একেবারেই মনে পড়ছে না। তার বদলে কেবলই ভেসে উঠছে একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত আমেরিকান প্যাটন ট্যাঙ্কের বিকৃত চেহারা, কালকের কাগজে ছবিটা ছাপা হয়েছিল। ড্রাইভারের সীটের সোফার উপরে মণিকার হাতটা পড়েছিল ক্লান্তভাবে। একটা আঙুলে আংটি। এত অন্ধকারেও আংটির সোনায় কোথা থেকে আলো লেগেছে। ইচ্ছে করল মণিকার হাতটা টেনে নিই। নিয়ে বলি—আমাকে ক্ষমা কর মণিকা। তোমার মনের নিঃসঙ্গতাকে না বুঝে অনেক চটুল ঠাট্টা করেছি।

রাস্তার বাঁ-দিকের পেট্রোল পাম্প। ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললাম। মণিকা আমার দিকে তাকাল।

—তুমি নামবে?

—নামতে হলে এখানেই নামতে হয়। কিন্তু—কিন্তু আমি চাইছিলাম তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

—না, দরকার হবে না—শ্যামল। এই অন্ধকারে অতদূর যেতে হবে না।

—না, শুধু সেজন্যে নয়। তোমাদের বাড়িটা চিনে আসতুম। কোন খোঁজখবর এল কিনা প্রদীপ্তর সেটা জানা যেত।

—ঠিকানাটা লিখে নাও। আমাদের কলেজে ফোনও করতে পার।

—আচ্ছা, ঠিকানা, ফোন নাম্বার দুটোই দাও।

মণিকার বাসার ঠিকানা ও কলেজের ফোন-নাম্বার দুটোই লিখে নিলাম ডাইরীতে। নামবার সময় একটা দু-টাকার নোট মণিকার দিকে এগিয়ে বললাম

—কিছু মনে কোরো না মণিকা। আমিও কিছু শেয়ার করি।

মণিকা বিরক্ত মুখে আমার হাতটাকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

—ইয়ার্কি কোরোনা শ্যামল। যা-আ-আ-ও।

ট্যাক্সী থেকে নামলাম। পলকে সেটা অদূরের অন্ধকারে মিশে গেল। আমি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। মণিকার কথা ভাবছিলাম। মণিকার শেষ কথাটুকু। একটু যেন বিদ্রূপ ও বিরক্তি মেশানো। যা-আ-আ-ও। কোথায় যাবো? ঘরে? নিজের স্ত্রী-পুত্রের কাছে? নিজের নির্বিঘ্ন নিদ্রাভূমিতে? তাই তো? তোমার স্বামী যুদ্ধে। তোমার চোখে রাত্রি এখন ঘুম এনে দেবে না। এখন শিমুল-তুলোর বালিশকেও মনে হবে কাঠের তক্তার মত কঠিন। প্রতিনিয়ত একটা দুর্বিষহ আশঙ্কায় উদ্বেগে তুমি রুগ্ন হবে। নিজের শিশুপুত্রের গালে চুমো দিতে গিয়ে হঠাৎ মুষড়ে-ওঠা ব্যথায় তোমার ঠোঁটের স্নেহ শুকিয়ে যাবে। এ-সবই সত্যি। তুমি যেহেতু প্রদীপ্তর বিবাহিত স্ত্রী। কিন্তু আমরা কি প্রদীপ্তর কেউ নই? প্রদীপ্ত আমার সবচেয়ে প্রিয়তম বন্ধু ছিল। প্রদীপ্তকে আমরাই ক্যাম্পেন করে, মেজরিটির ভোটে ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিনের এডিটর করেছিলুম—তুমি

নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি। প্রদীপ্ত প্রুফ দেখতে জানতো না। দেখে দিয়েছি। প্রদীপ্ত একটু আয়েসী মেজাজের ছেলে ছিল তখন। প্রদীপ্তর হয়ে আমিই সমস্ত কাজ করে দিয়েছি—লেখা সংগ্রহ, ইলাসট্রেশান, মলাট আঁকানো, ব্লক, ছাপা সবই। প্রদীপ্ত অধিকাংশ দিন সিগারেট খেয়েছে আমার পয়সায়। তা ছাড়াও আরো অনেক কিছু, অনেক কিছু, মনে পড়ছে না—হ্যাঁ মনে পড়ছে একটা দিনের কথা—তোমারও নিশ্চয়ই মনে পড়বে মণিকা—

গোপন ও অত্যন্ত জরুরী মিটিং-এর দোহাই দিয়ে সুশীলের মেসের একটা ঘরে একবার বৈঠক বসেছিল মনে আছে? একদিন দুপুরে? কিন্তু সে মিটিং-এ কেউ এল না। আমি সুশীল আর প্রদীপ্ত ছাড়া। কোরামের অভাবে মিটিং বন্ধ হল। একটু পরে তুমি এলে। আমরা উত্তেজিত ও বিরক্তভাবে উঠে এলাম। তোমাদের দুজনকে একা রেখে। বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছিলাম। বেশী দূর যায়নি। একতলায় নামার কাঠের নড়বড়ে সিঁড়িটার কাছেই দাঁড়িয়ে আমরা সময়টা কাটিয়েছিলাম অকারণ রাজনৈতিক তর্ক করে। তুমি অত্যন্ত চতুর মেয়ে ছিলে মণিকা। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলে সবটাই অভিনয়। সবটাই আমাদের সাজানো। প্রদীপ্তর অনুরোধে সৃষ্টি করা। প্রদীপ্ত তোমার সঙ্গে গোপনে মিশতে চেয়েছিল। প্রদীপ্তকে ভালবেসেই আমরা এ-সব করেছিলাম। এসব কি খুবই তুচ্ছ! প্রদীপ্তর জন্যে পৃথিবীতে শুধু তুমি একাই চিন্তিত—এটা ঠিক নয়। তোমার দুঃখের পরিমাণ বেশী—এইটুকুই তফাত।

বাড়ি ফিরে এলাম। রাত্রে গাঢ় নিদ্রা হল। ঘুম ভাঙল একটা ভয়াবহ স্বপ্ন ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে। জম্মু কিংবা ছাম্ব কিংবা শিয়ালকোট কোথাকার একটা যুদ্ধক্ষেত্রে আমি মরতে যাচ্ছিলাম, গুলী খেয়ে। চোখ মেলে দেখি সামনে দাঁড়িয়ে রমা।

—কখন থেকে ডাকছি। চা, জুড়িয়ে গেল।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে প্রদীপ্তর কথা মনে পড়ে গেল আবার। কিন্তু এ কী আশ্চর্য ব্যাপার। প্রদীপ্তর মুখটা কিছুতেই মনে পড়ছে না কেন? সবটা কেমন আবছা আবছা।

৩

বেশী সময় লাগল না। বিকেল চারটের টেলিগ্রামে তার মুখ দেখতে পেলাম। এই তো প্রদীপ্তর মুখ। শুধু সৈনিকের পোশাক পরে আছে বলে একটু ভারী ও গম্ভীর লাগছে। খুব বড় করেই ছাপানো হয়েছে ছবিটা। ছবির নিচে বড় বড় করে লেখা—মৃত্যুঞ্জয়ী প্রদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়। নিচে বিশদ বিবরণ। শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে কীভাবে সংগ্রাম করেছিল। তার এই বীরোচিত আত্মোৎসর্গের ফলেই সম্ভব হয়েছে শত্রুপক্ষের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল।

ছুটি-পাওয়া লোকের ভিড়ে এসপ্লানেডে লোকারণ্য। হাজার হাজার মানুষের হাতেই টেলিগ্রাম। প্রত্যেক টেলিগ্রামেই প্রদীপ্তর মুখ। তীব্র ইচেছ করল এইখানে দাঁড়িয়ে একটা বিধ্বংসী কামানের মত গর্জন করে বলি

—এই প্রদীপ্ত আমার বন্ধু।

পারলাম না। তখন আমার বুকের ভিতরে যেন একটা ভারী ট্যাঙ্ক হেঁটে চলেছে।

এই টেলিগ্রাম বারাসতে পেঁছিতে রাত্রি হবে। মণিকা এখনো খবর পায়নি। ওকে কি ফোন করব? পারা যাবে না। তা হলে? আজ শুক্রবার। রবিবার ওর ছেলের জন্মদিন। সারা শহরের মানুষের হাত থেকে কি এই টেলিগ্রামগুলো ছিনিয়ে নেওয়া যাবে? যাবে না। খবর পেয়ে মণিকা যদি হার্টফেল করে? কে আছে

তার পাশে ? এই সময় যে বড় বেশী সাহস ও সান্ত্বনার প্রয়োজন। এখন ওকে খুব ভাল করে বুঝিয়ে বলা দরকার যে প্রদীপ্ত মরেনি।

ভেবেছিলাম ভোরেই যাব। হল না। ভোরের কাগজে দেখলাম সে অনেক সান্ত্বনা পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি তাঁদের ব্যক্তিগত শোকবার্তায় সম্মান জানিয়েছেন প্রদীপ্তর এই মহৎ মৃত্যুকে। আজ থাক। কাল ওর ছেলের জন্মদিন। কাল যাব। আপিসের পর।

কড়া নাড়তেই একটু পরে একজন বৃদ্ধা দরজাটা খুলে দিলেন। এখানেও ব্ল্যাকআউটের অন্ধকার।

—কাকে চাই ?

—মণিকা আছে ?

—কোথা থেকে আসছেন আপনি ?

—এইদিকেই থাকি। মণিকার সঙ্গে একটু ব্যক্তিগত দরকার ছিল।

—ও তো বাড়িতে নেই।

—নেই ? কোথায় গেছে ?

—ভবানীপুরে।

—ওঃ। কাকীমার বাড়িতে। আজ ফিরবে তো ?

—হ্যাঁ, ফিরবে।

—আমি কি তা হলে একটু ঘুরে আসবো ? একটু পরেই না হয়—

—সেই-ই ভাল। আপনার নামটি বলে যান।

—আমার নাম শ্যামল। আচ্ছা, মণিকার ছেলে কি এখানে আছে ?

—আছে।

—তা হলে আপনি দয়া করে এই বাক্সটা নিন্। মণিকার ছেলের হাতে দেবেন। আজ ওর জন্মদিন।

প্যাকেট বৃদ্ধার হাতে দিয়ে চলে আসবো, তিনি আমাকে থামালেন।

—তুমি শ্যামল? চিনতে পারিনি তোমাকে। এসো বাবা, ভেতরে এসো···

ঘরের ভিতরের আলোয় গিয়ে প্রণাম করলাম প্রদীপ্তর মাকে, মাসীমাকে। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদই করলেন সম্ভবত।

একটা ছোট্ট সাজানো ঘরের মধ্যে তিনি আমাকে বসতে দিলেন। বড্ড ছোট মাপের ঘর। দুজনের পক্ষে বাস করা কঠিন। একটা ডাবল-বেড খাট পাতার পর আর জায়গা নেই। কোনমতে একটা ড্রেসিং টেবিল ও একটা আলমারি এঁটেছে। ড্রেসিং টেবিলের ওপরে একটা বাঁধানো ছবি। প্রদীপ্ত ও মণিকার। বিয়ের দিনের ছবি। আমি জানি। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের ওখান থেকে বেরিয়ে আমরাই ওদের দুজনকে নিয়ে গিয়েছিলাম চৌরঙ্গীর একটা স্টুডিওয়। এ ছাড়াও মণিকার একার একটা ছবি আছে। খুব লাস্যময়ী চেহারার। যে ছবিতে প্রদীপ্ত একা, সেটা সাদা বেল ফুলের মালা দিয়ে সাজানো। গত কালকের মালা। তাই সাদা নয় পুরোপুরি এখন। কোন কোন পাপড়ি পেকেছে। একটু দূর থেকে মনে হয়, সাদা ফুলে লাল রক্তের ছিটে।

একটু পরে প্রদীপ্তর মা বিছানায় আমার পাশে এসে বসলেন মণিকার ছেলেকে কোলে নিয়ে। মাসীমা এখন অনেক বৃদ্ধ। আগে মাসীমার চোখে চশমা দেখিনি। গালের ও হাতের মাংস কুঁচকে ঝুলে পড়েছে। তাঁর হয়তো আমার সঙ্গে কিছু কথা বলার ছিল। কেন না প্রদীপ্তর সঙ্গে তিনি আমাদের অসংখ্যবার দেখেছেন ওঁদের বিডন স্ট্রীটের বাড়িতে। কিন্তু তিনি চুপ্ করে বসে রইলেন। শোকার্ত মানুষের স্তব্ধতা বড় দুঃসহ। অথচ আমার পক্ষেই বা কী বলার আছে। সুতরাং পাথরের মত

ভারী এই স্তব্ধতার মধ্যেই মাসীমা হয়তো মনের কথা মনে মনে, আমিও আমার মনের কথা মনে মনেই বলছি কিংবা ভাবছি। কেবল মণিকার ছেলে, বাপের পরিপূর্ণ আকৃতি-পাওয়া মণিকার সদ্য চারে পা-দেওয়া ছেলেটি মাসীমার কোল থেকে নেমে আমার উপহার দেওয়া টিনের বন্দুকটা হাতে নিয়ে আমার দিকে, তার বৃদ্ধা ঠাকুমার দিকে, ঘরের ভেতরের আলমারির দিকে, আয়নার দিকে, বাঁধানো ছবির দিকে, ঘরের বাইরের অন্ধকারের দিকে, আমাদের স্তব্ধতার দিকে, আমাদের প্রত্যেকের অবরুদ্ধ বেদনার দিকে তার দুটি কোমল বাহুর সমস্ত শক্তি দিয়ে একটানা গুলী ছুঁড়ে চলেছে।

ব্যামো

কুন্দর মা পঞ্চীর বুকের ভিতরে একটা পাথর জমেছিল। সেটা গলে গেল আজ, কুন্দর শ্বশুড়বাড়ি থেকে গেবোর ফিরে আসার পর। গেবো অর্থাৎ গোবিন্দ কুন্দর ছোট ভাই। পঞ্চী তাকে পাঠিয়েছিল মেয়ের খোঁজ নিতে। এমনিতে দেখা করতে কাউকে পাঠালে কে কি ভাববে, তাই তত্ত্ব পাঠানোর ছলে ছেলেকে পাঠিয়েছিল সে। তত্ত্ব মানে কোনো বড়লোকি ব্যাপার-স্যাপার নয়। বাগানের আনাজ-পাতি, ফল-মূল, শাক-সবজি। একদিন থেকে গেবোর ফিরে আসার কথা। গেবো ফিরল তিনদিন পরে। গেবোর ফিরতে দেরী হচ্ছিল বলেই পঞ্চীর বুকের ভিতরের পাথরটা আকারে বড় আর প্রকারে শক্ত হয়ে উঠেছিল ক্রমশ। কি জানি আবার কি দুর্ঘটনা ঘটল কিছু? আবার কি ফিরে এল নাকি সেই অলুক্ষণে ব্যামো? চলতে ফিরতে পঞ্চী দিন-দুবেলা মনে মনে প্রণাম করেছিল ঠাকুর দেবতাকে।

—হে মা মহামায়া, হে মা বিশালাক্ষী, হে মা দুর্গা, হে মা জগদ্ধাত্রী, মোর মেয়েটাকে সুখে রাখ গো মা! আর ওকে কষ্ট দিওনি। একটু সুখে শান্তিতে সংসারটা করতে দাও মা। তোমাদের পায়ে কিছু তো অপরাধ করিনি গো মা জননী!

গেবো আজ ফিরে এল। গেবোর গলার সাড়া পেয়ে গোয়াল-ঘর থেকে গরুর জাবনা মাখা হাতেই ছুটে আসে পঞ্চী।

—কখন এলি?

—এই তো, এই মাত্র এনু।

—বোস্। বোস্। কুন্দ কেমন আছে বল।

—কেমন থাকবে আবার? ভালই তো আছে।

—ভালই আছে? তোকে দেখে কাঁদল-টাঁদল নাকি।

—না। কাঁদবে কেন শুধু শুধু। বেশ তো আছে হাসি-খুশী হয়ে।

—তুই যখন এলি, তোর আসার সময় কাঁদেনি-টাঁদেনি তো?

—না। আমার সঙ্গে তো এল ওদের পুকুরপাড় পর্যন্ত। শুধু বললে, সময় পেলে এমনি করে চলে আসিস তুই। আর চারআনা পয়সা গুঁজে দিল মোর হাতে '

—শ্বশুড়বাড়ির লোকজনকে কেমন দেখলি? ওকে ভালবাসে তো?

—ভিতরে ভিতরে কে কি বাসে না বাসে জানিনি। বাইরে তো দেখাল কুন্দ বলতে সবাই যেন অজ্ঞান।

—এই ক-মাসে আর সে রকম মাথার এ-টে হয়নি তো?

—উ সব কথা কি আমি জিজ্ঞেস করেছি নাকি?

আরও অনেক প্রশ্ন ছিল পঞ্চীর। পরে করবে ভেবে উঠে পড়ে। বুকের পাথরটা গলে যাওয়ার আনন্দে পাথরের স্তূপের মত জমে থাকা ঘর-সংসারের কাজে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে পঞ্চী। গঙ্গাধর মাঠ থেকে ঘরে ফিরলে পঞ্চী এক নিশ্বাসে কুন্দর শ্বশুর-বাড়ির গল্প বলে। গঙ্গাধর গম্ভীর প্রকৃতির লোক। সে হুঁ, হ্যাঁ ছাড়া অন্য কোন কথা বলে না।

বিকেলে ঘোষেদের বাড়িতে ধান ভানতে গিয়ে পঞ্চী পাড়া-পড়শীদের শুনিয়ে কুন্দর কথা বলে। বলার ছন্দে অথবা আবেগে গেবোর দেওয়া বর্ণনা ছাড়াও সে নিজের মত করেও বানিয়ে নেয় কিছু। কুন্দ সুখে আছে, শ্বশুর শাউড়ী কুন্দ বলতে অজ্ঞান। জামাইও কি ভালবাসাই না বাসে। এই তো তিনমাস হয়নি গেছে। গয়না গড়িয়ে দিয়েছে দুখান। গেবো গিছল। তিন দিনের আগে ছাড়েনি। আবার আসবার সময় কুন্দ পয়সা দিয়েছে চার আনা।

পঞ্চী যতটা বলে, তার সবটাই পড়শীদের কানে ঢোকে না। কানে তারা ঢোকাতে চায় না বলে নয়। ঢেঁকীর পাড়ের নিয়মিত

গমাক গঁক্, গমাক গঁক্ শব্দে তার অনেক কথা চাপা পড়ে যায় বলে। তবু পঞ্চী কথা বলে বড় সুখ পায় আজ।

ধানভানা শেষ করে ধামা কাঁধে নিয়ে পঞ্চী যখন ঘরে ফিরছিল; মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল শান্তখুড়ীর সঙ্গে। বুড়ি থুত্থুড়ি। লাঠি ঠুকঠুক করে হাঁটে। কোমরের কাছ থেকে কুঁজো। চোখে ছানি। তবু ঘরে থাকতে পারে না। এর বাগান, ও পুকুরপাড়ে শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে বেড়ায়। এখন তার কোমরে এক গোছা শুকনো বাবলা ডাল।

—কে যাউ লো?

পঞ্চীর তাড়া ছিল। অন্যদিন হলে উত্তর না দিয়ে চলে যেতো। আজ সে দাঁড়ায়।

—আমি পঞ্চী গো খুড়ি।

—ও পঞ্চী। কোথাকে গেছলু?

—ধান ভানতে। ঘোষেদের বাড়ি।

—তা ভাল। হ্যাঁ লা ওবৌ, তোর সেই মেয়েটার কুনু খবর পেলু আর?

—কেন পাবো নি খুড়ি। খবর তো নিত্য-নিয়মিতই পাচ্ছি। আসা-যাবা তো লেগেই আছে। এই তো গেবো গিছল দিন তিনেক আগে। আজ ফিরল।

—কি বলল সে? সব ভালো খবর তো?

পঞ্চী আবার সবিস্তারে সবটা বিবরণ শোনায়। সব শুনে শান্তখুড়ী বলে

—খুম্ ভাল হয়েছে। যাক্ মা সেও বাঁচল, তোরাও বাঁচলি। মন পেতে ঘরসংসার করছে, সেইটেই বড় সুখের। তোরা বড়ো অল্পেতে ভেঙে পড়িস কুন্দর মা। মুই বলিনি বিয়ে দিয়ে দে, মেয়ের বিয়ে দিয়ে দে। সব ব্যামো সেরে যাবে। বিয়ের জল, গঙ্গাজল।

আইবুড়ো মেয়েদের অনেক দোষ-পাপ থাকে শরীরে মনে। বিয়ে দিয়ে দিলে সব শুদ্ধ। সব সেরে যাবে। তোরা তো তখন কেউ শুনলুনি মোর কথা। ডাক্তার, বদ্যি, কোবরেজ, ঝাড়ফুঁক কত রকম করলি, কত পয়সা জলে ঢাললি বল দিক্‌নি।

কথা শেষ হলে পঞ্চী আর দাঁড়াতে চায় না। কিন্তু শান্ত-খুড়ীর ডাকে আবার তাকে থামতে হয়।

—কি বলতেছ?

—হ্যাঁ লা, গেবো ফিরে এসে কি বলল? ছেলে পুলে এসেছে পেটে?

এ প্রশ্নটা পঞ্চীর মাথাতে আসে নি। সত্যি তো সে রকম কিছু ঘটেছে কিনা জিজ্ঞাসাই করা হয়নি গেবোকে। পঞ্চী বলে

—না। সে সব কিছু হয়নি।

—হলে বড় ভালো হতো বৌ। এখনো যদি ব্যামোটার ছিটে-ফোঁটা লেগেও থাকে কুনুখানে, সব চলে যেতো।

ঘরে ফিরে এসেই পঞ্চী গেবোর খোঁজ করে। সে বাড়িতে নেই। কুন্দ পোয়াতি হয়েছে কিনা এই খবরটা নেবার জন্য আই-ঢাই করে ওঠে পঞ্চী।

২

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। একটা দুটো করে নক্ষত্র ফুটে উঠেছে আকাশে। তবে রাতের আলো যতটা বাড়ছে, গাছপালার বাতাস তত কমছে। প্রকৃতি যেন পাথর। এতটুকু নড়াচড়া নেই তার কোনখানে।

সাবিত্রী সন্ধ্যে বেলা গিয়েছিল জল আনতে শিবতলার টিউবওয়েলে। সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুন্দর বিবরণ শুনল সে। এবং সে জানে, খানিকটা আবার শোনান হল তাকে শুনিয়েই।

দিন-মজুরি খেটে বাড়ি ফেরার কথা এক সঙ্গে দুভায়ের। সাবিত্রীর স্বামী নিমাই একা ফিরল দেখে সাবিত্রী বলে

—ঠাকুরপো কোথা গেল ?

—সে কি এখুনি ঘরে ফিরবার ছেলে ? কোথাউ বসে গেছে আড্ডা দিতে।

সাবিত্রী জানে কোথায় সে আড্ডা দেয়। স্বামীকে সন্ধ্যের খাবার দিয়ে সাবিত্রী ছুটে যায় পাড়ুইদের বৈঠকখানায়। ঐখানে তাস্ পেটানোর আসর বসে রোজ। নিতাই নিজে তাস খেলে না। অপরের খেলার হার জিৎ দেখে যাওয়াটাই তার নেশা।

সাবিত্রীর ডাকে ভয় পেয়ে যায় নিতাই।

—কি হয়েছে ?

—কিছু হয়নি। তুমি এসো না।

সাবিত্রীকে একটা অদ্ভুত রকম খাতির করে নিতাই। গোঁয়ার গোবিন্দ সে আর সকলের কাছে। সাবিত্রীর কাছে যেন সরল শিশুটি। খানিকটা রাস্তা দুজনে হাঁটে নীরবে। তারপরেই লোকালয়ের বাইরে ফাঁকা জায়গায় এসে সাবিত্রী থমকে দাঁড়ায়, এতক্ষণ ঘোমটা ছিল মাথায়। খুলে ফেলে। তারপর সাপের মত ফোঁস করে ওঠে হঠাৎ।

—তোমার এই ধেড়েমি কাণ্ড কারখানাটা থামাও তো এবার।

নিতাই এমন ঘাবড়ে যায় সাবিত্রীর আচরণে যে, কথা বলতে গিয়ে জড়িয়ে যায় তার জিভ্।

—কেন, কি করেছি আমি ?

—আর অত প্রেম-পীরিতের খেলা দেখাতে হবে নি তোমাকে। উসব ছাড়ো দিক্‌নি এবার। কাল থেকে আমি মেয়ে খুঁজতে শুরু করবো। একদম ট্যা-ফোঁ-টি করবেনি বলে দিচ্ছি।

—তুমি তো আচ্ছা মানুষ! কি হয়েছে না বলে শুধু-মুদু গালাগালি করতেছ।

—বলি যার জন্য এতদিন বিয়ে না করে বসে রইলে, আবার তার বিয়ে-থা হয়ে যাবার পর এখন বসে আছ সে সুখী হবেনি, সুখী না হয়ে তোমার কাছে ফিরে এসবে, এই সব সাত কাণ্ড ভেবে, তার খবর শুনেছো কিছু ?

—না তো।

—আমি শুনেছি। তিনি বেশ মনের সুখে সংসার করতেছেন। শ্বশুর শাউড়ী ভাতার সকলের একদম আদরিণী। বুঝেছ ? এবার পরের ভাবনা বাদ দিয়ে নিজের ভাবনাটা ভাবো দিক্‌নি।

নিতাই হঠাৎ হেসে ওঠে।

—কে বলেছে তোমাকে কথাগুলো ?

—নাম জেনে তোমার কি হবে ? কথাগুলো সত্যি। সেইটেই শুনে রাখো।

—সত্যি না ছাই !

—ইসব কথা মিথ্যে ?

—মিথ্যে তো বলিনি। আমি বলতেছি ওর সুখী হবার কথা। সুখী হবে না ছাই হবে।

—থাক্ তোমাকে অত ভবিষ্যৎবাণী করতে হবে না। চল ঘরে চল। আমি যা করার এবার করতেছি।

সত্যি সত্যিই পরের দিন থেকে নিতায়ের জন্য মেয়ের খোঁজ করতে লাগল সাবিত্রী। আর নিতাই ক্রমশ এড়িয়ে চলতে লাগল সাবিত্রীকে। শুধু সাবিত্রীকে নয়। তাসের আড্ডা, বন্ধু-বান্ধব, হাসি-ঠাট্টা, সব কিছু। একা একা থাকে। একা এক ঘোরে। সন্ধ্যেবেলা চুপচাপ বসে থাকে খালের পাড়ে, তালগাছের নিচে। কিংবা বাঁধের ঘাসে শুয়ে আকাশ দেখে। আর আপন মনে ভেবে যায়। পৃথিবীর রহস্য ভাবতে ভাবতে কখনো হাসে। কখনো গরগর করে ওঠে বুনো জানোয়ারের মত। নিতাই কি ভাবে তা অন্যেরা, এমনকি তার সবচেয়ে কাছের মানুষ, সাবিত্রী, সেও টের পায় না

কিছু। টের পায় কেবল তার শরীরের পরিবর্তনটা। ইঁট-চাপা ঘাসের মত কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে চলেছে তার গায়ের রঙ। কালি পড়েছে চোখের নিচে। কথাবার্তায় দেখা দিয়েছে কর্কশতা। খাওয়া-দাওয়ায় অরুচি। আগে সে একাই ভাত খেতো এক কাঁসা। সঙ্গে ভালমন্দ তরি-তরকারী থাকলে আরো বেশী। এখন সে-খাওয়া একদম অর্ধেক।

সাবিত্রী অনেকবার পেড়াপেড়ি করেছে। মাথার দিব্যি দিয়েছে। না বললে আর তোমার সঙ্গে কথা বলবোনি, বলে ভয় দেখিয়েছে। নিতাই মুখ খোলেনি। সাবিত্রী শেষ পর্যন্ত রাগে জ্বলে ওঠে একদিন।

—বিয়ের আগে যা করেছ করেছ। এখন তার বিয়ে হয়ে গেছে। সংসার করতেছে। দুদিন বাদে ছেলেমেয়ের মা হবে, এখনও তাকে নিয়ে ভেবে ভেবে শরীর খারাপ করে যাবে? নিজের ভবিষ্যৎ ভাববে নি?

নিতাই বসেছিল দাওয়ায়। দুটো হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে। সাবিত্রী দাঁড়িয়েছিল উঠোনে। নিতাই হঠাৎ তার মাথার ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে জবা ফুলের মত দুটো টকটকে লাল চোখে তাকাল সাবিত্রীর দিকে।

—ছেলেমেয়ের মা কে হবে শুনি? নামটা বলতো একবার।

—কে আবার? কুন্দ। বিয়ে হয়েছে, ছেলেমেয়ে হবে, ইতো জানা কথা।

নিতাই হঠাৎ দাওয়া থেকে এক লাফে উঠোনে নামে। যাত্রার অভিনেতার মত ভঙ্গী করে দাঁড়ায় সে। গলার স্বরটাও পাকা অভিনেতার মত নাটকীয়।

—অত সোজা নয় গো, অত সোজা নয়। মা মহামায়ার মন্দিরের মাটি ছুঁয়ে সে পতিজ্ঞা করেছে আমার কাছে, উ-শরীর সে আর কাউকে দিবে নি। ওর মাথার ব্যামো, ফিটের ব্যামো, কে

সারালো বল দিক্‌নি। জানো? তোমরা তো জানো ঝাড়ফুঁকে সেরেছে। সেরেছে এই নিতাই দাসের কথায়। বিয়ে করার অনুমতিটা দিল কে? জানো? এই নিতাই দাস। আমি বুঝিয়ে বলেছিনু তুই বিয়ে কর কুন্দ। কিন্তু মোর সাথে যে তোর গোপন বিয়েটা হয়ে গেছে, সেটা ভুলবিনি তো কুনুদিন? কুন্দ তখন ঘাড় নেড়ে না বলেনি? তবে? রসিকতা হচ্ছে? আমার সঙ্গেই ইয়ার্কি হচ্ছে?

সাবিত্রীর শরীরটা ভিতরে ভিতরে থরথরিয়ে কাঁপে। কুন্দর কথা ভেবে ভেবে এই মানুষটাও কি কুন্দর মত মাথার ব্যামোয় পাগল হয়ে যাবে নাকি? আরও একটা সমস্যা বিমর্ষ করে সাবিত্রীকে। এখন ঘর-দুয়োরে কেউ নেই। কিন্তু এই সব পাগলামির কথা যদি কোনদিন বাইরেও বলতে আরম্ভ করে, গ্রামশুদ্ধ মানুষের কানে গিয়ে, পেঁছোয়, কি কাণ্ডটা হবে সেদিন!

এবং শেষ পর্যন্ত, সাবিত্রী যা আশঙ্কা করেছিল তাই ঘটল একদিন। চৌধুরীদের বাড়িতে কাজ করতে গিয়েছিল নিতাই। ঘর-ছাউনির কাজে। ঘরামি অন্য গ্রামের লোক। নিতাই যোগানদার। মাটিতে ডাঁই করা খড়ের স্তূপ থেকে গোছা গোছা খড় নিয়ে সে শুধু ফিঁকে দিচ্ছেল চালের উপরে বসে থাকা ঘরামিকে। সদ্য গাদা ভেঙে খড়গুলোকে উঠোনে জমানো হয়েছে। সকাল থেকেই একটা লাল রঙের ফড়িং নিতায়ের চার পাশে ঘুরঘুর করছিল। নিতাই তাড়িয়ে দেয়। আবার নিতাইকে বেড় দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে বসে একটা খড়ের ডগায়। নিতাই ধরতে গেলে ফুরৎ করে পালায়। দু-দশ মিনিট পরে আবার ফিরে আসে। তাকে ধরার জন্য দৌড়াদৌড়ি করে নিতাই। ঘরামি হাঁক দেয় উপর থেকে

—কোথা গেলু রে, ও নিতাই।

ঘরামির হাঁকডাক কানে যায় চৌধুরী কর্তার। তিনি এসে দেখতে পান নিতাই উঠোনময় দৌড়াদৌড়ি করছে একটা ফড়িং ধরবে বলে। বীরেনবাবু রাশভারী লোক। তিনি বিরক্তভাবে নিতাইকে শাসান।

—তোমাকে কাজ করতে ডাকা হয়েছে কি ইয়ার্কি করার জন্যে? এ্যাঁ! কি হচ্ছে কি? ঘরামি খড় খড় করে চেঁচাচ্ছে, কানে যাচ্ছেনি তোমার? এ্যাঁ?

নিতাই একবার মাত্র থমকে দাঁড়িয়ে বীরেনবাবুর কথাটা শোনে। তারপর আগের মতই ব্যস্ত হয়ে পড়ে লাল ফড়িংয়ের খোঁজে। উঠোনময় ঘুরে কোথাও খুঁজে পায় না তাকে। উঠোন ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। গাবভেরেণ্ডা, ধুতরো, সাদা কলকে, রাংচিতের ডালগুলোকে চিরে চিরে লাল ফড়িংটা খোঁজে। ঘরের মাথার চাল থেকে ঘরামি নেমে এসেছে মই বেয়ে। বীরেনবাবু স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে আছেন উঠোনে। চৌধুরীবাড়ির লোকজন ছেলেমেয়েরাও অবাক হয়ে গেছে নিতায়ের আচরণে। ছোট ছেলেমেয়েরা মজা পেয়েছে দৃশ্যটার ভিতরে। তারা নিতায়ের পিছনে পিছনে হাঁটে।

ঘরামি বীরেনবাবুকে প্রশ্ন করে,

—ওর কি মাথ-টাথা খারাপ ছিল নাকি বাবু?

—না। মাথা খারাপ হবে কেন? কতদিন তো কাজ করছে। ও, ওর দাদা, আমার কতদিনের ভাগচাষী। এ রকম তো করে না।

—এখন থালে কি করবেন? আর কাউকে ডাকবেন না কি?

—কিছু তো বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা—

বীরেনবাবুর স্ত্রীও নেমে আসেন স্বামীর পাশে। তাঁর চোখেও বিস্ময়।

—নিতাই তো অমন করার ছেলে নয়। বেশ বাধ্য-বাধক ছেলে।

ফড়িং খুঁজতে খুঁজতে নিতাই চলে গিয়েছিল বাগানের ভিতরে। ইতিমধ্যে গ্রামের কিছু লোকজনও এসে জড়ো হয়েছে চৌধুরীদের পুকুরঘাটের কাছে। নিতাইয়ের এই বিসদৃশ আচরণের সংবাদে তারাও বিমূঢ়। কেন এমন করছে, কি করে হল ইত্যাদি আলোচনায় তারা যখন অন্যমনস্ক, সেই সময় একটা জোরালো শব্দে সজাগ হল তারা। শব্দটা আসছে বাগান থেকে। শব্দটা বাচচা ছেলেমেয়েদের উল্লাস। বীরেনবাবু এবং তাঁর বাড়ির লোকেরাও এই শব্দে ঘাটের কাছে এসে দাঁড়ান। প্রতিমা বিসর্জনের সময় যেমন হয়, আগে বাজানা-বাদ্যি, নাচানাচি, পিছনে প্রতিমা, ঠিক সেই রকম ভাবেই সামনে একপাল উল্লসিত ছেলেমেয়ে আর তাদের পিছনে নিতাই, এগিয়ে আসছে বাগান ভেদ করে।

নিতাই যখন কাছে, সবাই দেখতে পেল হাত দুটো মুঠো করা। মাঝে মাঝে সে মুঠো হাতটা কানের কাছে নিয়ে গিয়ে কি যেন শুনছে। শুনতে শুনতে হাসছে।

ঘাটের কাছাকাছি এসে এতোগুলো মানুষকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে নিতাই এক মুহূর্ত ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। ভিড়ের মানুষগুলোকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। তার ভঙ্গী দেখে মনে হয় যেন সে কাউকেই চিনতে পারছে না। এবং তার মনে হয়, ভিড়ের মানুষগুলো যেন তার কাছ থেকে কিছু কেড়ে নিতে চাইছে। নিতাই তাই তার মুঠো করা হাতটা বুকের কাছে লুকোয়। কুঁচো-কাঁচারা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। নিতাই তাদের দিকে ঘুরে তাকায়। এবং নিজেও হেসে ওঠে সজোরে।

হাতের বন্ধ মুঠোটাকে উপস্থিত লোকদের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে সে বলে

—কি বলতো এর মধ্যে ? জানো ? কুন্দ গো কুন্দ। পালি গিছিল মোকে ছেড়ে। আবার ধরে আননু। দেখবে ? এই দেখ।

নিতাই হাতের মুঠোর ভিতর থেকে লাল ফড়িং-এর একটু-খানি বের করে দেখায়।

—দেখতে পেয়েছ? লাল পেড়ে শাড়ি পরে কার ঘরে গিয়ে যেন বৌ সেজে বসেছিল। কত কষ্ট করে ধরে আননু।

তারপর ফড়িং-এর ডানার কাছে মুখ নিচু করে বলে

—তোর নাকি ছেলেপুলে হবে? তুই নাকি বিয়োবি ইবার? বলতে বলতেই একটা লাল পালক ছিঁড়ে ফেলে হ্যাঁচকা টেনে। চোখে তখন ক্রুর একটা চাউনি। তারপরই হঠাৎ হাসে। হাসতে হাসতে চলে যায় অনেক দূরে।

৩

দুপুরবেলা রোদে পুড়তে পুড়তে সাবিত্রী ছুটে যায় পাশের গ্রামে কানাই বাগদীর কাছে। কানাই এই অঞ্চলের ওঝা।

—ও বাগদীর পো! এখুনি মোদের বাড়িতে চল না গো একবার।

—কি হয়েছে? কার ব্যামো?

—মোর দেওরের। মাথার ব্যামো। ভুল-ভাল্ বলতেছে।

—তুমি নিমায়ের বৌ নয়?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। যেতে যেতে কথা বলবে চলো।

—তোমাদের গেরামে সেই গঙ্গাধরের মেয়েটা সেরে গেছে একদম? তারও তো মাথার ব্যামো হয়েছিল। ভুল বকতো। আমিই সারানু।

—সেই অলুক্ষুণে মাগীটাই তো যত নষ্টের গোড়া।

—কার কথা বলতেছ?

—না। আমি অন্য কথা বলতেছি। আপনি চলো গো।

কানাই সাজগোজ করে বেরোয়। সাজগোজ মানে গায়ে

ফতুয়া, তার উপর গামছা। পায়ে একটা শুকনো চটি। হাতে লাঠি। আর হাতে কালো মতন বেতের একটা চুপড়ি। বেত বুনেই সংসার চালায় কানাই। ঝাড়-ফুঁকের ডাক আসে কুচিৎ-কদাচিৎ। এলে বড় খুশী হয়। মানুষের হাড়ে-মজ্জায় কিছু কিছু উদ্ভট ব্যামো এখনও টিকে আছে বলেই লোকে তাকে এখনো খাতির করে ডাকে। সেও তার অলৌকিক প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পায় কিছুটা।

৪

বিকেলের দিকে, বিকেলটা যখন ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে, তখন পঞ্চী কাঁদতে আরম্ভ করে গোয়াল ঘরের পিছন দিকের দেয়ালে ঘুঁটে দিতে দিতে।

বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল মোর মেয়েটা। এই ব্যামোর খবরটা যদি মেয়েটার কানে গিয়ে পেঁছোয়, যদি খবর শুনে মেয়েটার মাথার ব্যামোটা আবার ফিরে আসে, সেও যদি স্বামী সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসে উলঙ্গিনীর মতো? হায়! হায়! কি সব্বোনাশটা হবে গো আমার! ঐ অলুক্ষুণে ছেলেটা মোর মেয়েটার সারা জীবনটাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খেল। বিয়ের আগে খেয়েছে। আবার বিয়ের পরেও খাবে।

হায়! হায়!

হে মা মহামায়া, হে কালী, হে মা জগদ্ধাত্রী—

মাথার ব্যামো হলে লোক যেমন ভুল বকে, পঞ্চী তেমনি করেই তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর নাম উচচারণ করে চলল সন্ধ্যে পর্যন্ত।

অ্যানাসথেসিয়া

—হ্যালো-ও।

—এটা কি থ্রি সেভেন ফোর সিক্স নাইন সেভেন ?

—হ্যাঁ।

—সুশোভনবাবু আছেন ?

—কথা বলছি।

—নমস্কার। আমাকে আপনি চিনতে পারছেন না হয়তো এখন। মনে পড়বে কি ?

—কে আপনি, বলুন আগে।

—আমি সবিতা, মনে পড়ছে ?

—না, ঠিক মনে পড়ছে না। আপনার সঙ্গে কি আমার আলাপ হয়েছিল কোনও সময় ?

—বললুম তো এখন আর মনে থাকবে না। অনেক বিখ্যাত হয়ে গেছেন। ভুলে যাবেন সেটাই স্বাভাবিক। কবিতাকে মনে আছে ?

—দেখুন কিছু মনে করবেন না। আমি একটু ব্যস্ত আছি। আমার ছোট মেয়ের একটা সিরীয়াস অপারেশন আজ। এখুনি বেরোতে হবে। আপনার যা বলার যদি স্পষ্টভাবে বলেন, তাহলে—

—আমি সবিতা। এর চেয়ে আর স্পষ্ট করে কী বলবো। এছাড়া তো আমার আর কোনও পরিচয় নেই। কবিতা আমার দিদি। আমি এখন গড়িয়ায় থাকি। কবিতা বিয়ের পর চলে গেছে আমেরিকায়। আর কি বলবো ? আপনার লেখা চিঠিটা কিন্তু আমি হারাইনি।

—আপনাকে আমি চিঠি লিখেছিলুম নাকি ?

—না লিখলে আর পাব কোথা থেকে ?

—আপনাকে একটা অনুরোধ করবো ?

—বলুন।

—আপনি সন্ধ্যে সাতটার পর আমায় ফোন করবেন একবার। তখন শুনবো। এখন শোনার সময় নেই। আমি খুব ডিস্টার্ব। ট্যাক্সী দাঁড়িয়ে আছে।

—খুব দুঃখিত, এমন অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে। উনিশো সাতান্ন লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলেন কি ?

—হ্যাঁ।

—লক্ষ্ণৌ-এর কবিতা-সবিতা দুই বোনকে মনে পড়ছে না ?

—ওঃ লক্ষ্ণৌ ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি সেই সবিতা ? হ্যাঁ মনে পড়েছে। কী আশ্চর্য। হ্যাঁ, বলুন। সেতো কুড়ি-বাইশ বছর আগের কথা।

—খুব বিপদে পড়ে আপনাকে ফোন করছিলুম। আমি একদিন দেখা করতে চাই। কোথায় গেলে দেখা হবে যদি বলে দেন—

—দেখা ? আমার সঙ্গে দেখা করতে হলে—হ্যালো, হ্যালোও হ্যালোও—হ্যালোও। ইস্। নুইসেন্স। লাইনটা কেটে গেল। ছিঃ, ছিঃ, কী ভাববে কে জানে। ভাববে আমিই বুঝি লাইনটা কেটে দিলাম।

পিছনে অদিতি। ও তৈরী। ওর চোখে-মুখে ব্যস্ততা, উদ্বেগ। মেয়ের জন্যে ওর বিপন্নতা আমার চেয়ে বেশী।

—কে কী ভাববে ? ভাবে ভাবুক। তুমি ওঠ তো। আজকালকার টেলিফোন ঐ রকম।

—হ্যাঁ চলো।

আমরা দুজন ট্যাক্সীতে উঠলুম। ট্যাক্সী ছুটলো পার্ক-

সার্কাস নার্সিং হোমের দিকে। ট্যাক্সীতে চেপে একটু স্বাভাবিক হয়েছে অদিতি।

—কে ফোন করেছিল ?

—সবিতা।

—সবিতা কে ?

—কবিতার বোন।

—আমি কী ওদের চিনি নাকি ? এমনভাবে বলছো যেন—

—আমিও চিনি না। আলাপ হয়েছিল মাত্র দিন কয়েকের। লক্ষ্ণৌ-এ, সাতান্ন সালে।

—তো এতদিন বাদে ফোন করেছে কেন ?

—দরকার আছে হয়তো কিছু।

—চিঠির কথা কি বলছিল ?

—চিঠি ? ও কিছু নয়। একটা চিঠি লিখেছিলুম লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে।

—এতদিন বাদে সে-চিঠির কথা কেন ?

—কী করে বলবো ? ওর কাছে হয়ত মূল্যবান মনে হয়েছে। তাই রেখে দিয়েছে। সাধারণ চিঠি। কলকাতায় পেঁছিনোর সংবাদ। প্রেমপত্র নয়রে বাবা।

—প্রেমপত্র হলেই বা ক্ষতি কি ? ও-রকম তো অনেক লিখেছো।

—তা লিখেছি।

—সব মিলিয়ে কত হবে ?

—কোটি খানেক। তার মধ্যে তোমাকে গোটা ষাটেক।

—হেসো না, তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত।

—কেন লজ্জা পাবার কি আছে ? অন্যায় কিছু করেছি নাকি ?

—না, অন্যায় কেন হবে ? এই হ্যাংলামো স্বভাবটা খুব উঁচু দরের।

—একে হ্যাংলামো বলে না। গয়নার দোকানে গিয়ে তুমি যখন পঞ্চাশটা গয়না নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করো, শাড়ীর দোকানে একশটা শাড়ীর ভাঁজ খুলে গায়ে লাগিয়ে দেখো, অথচ কিনবে একটা কি দুটো, সেটাকে তো আমি হ্যাংলামো বলি না?

—সেটা আর এটা এক হল?

—কেন নয়? দুটোই তো সৌন্দর্যের, রুচির, নিজেকে সাজানোর ব্যাপার। প্রেমপত্র যে লেখে, সে কী লেখে, কাকে লেখে এটা মোটেই বড় কথা নয়। যখন লেখে; সে নিজেকে গয়না পরায়। সাজায়। তোমাদের মতই কপালে সিঁদুরের টিপ দেয়। কাজল পরে। নিজে যা, যতখানি, তার চেয়েও অপরূপ করে তোলে নিজেকে।

—থাক্। আর অত বোঝাতে হবে না। বোঝাতে খুব ওস্তাদ। টাকা এনেছো তো? ডাক্তারের? অ্যানাসথেসিয়ার?

—এনেছি।

—গাড়িটাকে একটু জোরে চালাতে বল না। নটা দশ হয়ে গেল।

—সর্দারজী, থোড়া জলদিসে চালাইয়ে। খুব তাড়া আছে।

গাড়ি নার্সিং হোমে পৌঁছে গেল। কেবিন নং বাইশের দরজায় গিয়ে দেখলাম ঘর ফাঁকা। পাশের ঘরের নার্স আমাদের দেখতে পেয়ে বললে,

—একটু আগে ও, টি, তে নিয়ে গেছে।

অদিতি তক্ষুনি সাপ হয়ে গেল। তার ছোবল—

—দেখলে তো! যাবার আগে মেয়েটার সঙ্গে দেখা হল না? কেঁদে-কেটে খুন হয়েছে। ছিঃ ছিঃ। কখন থেকে বলছি, বেরোও, বেরোও। তোমার জন্যেই এইসব হল।

অদিতি নার্সের দিকে ঘুরে তাকাল।

—খুব কেঁদেছিল?

—তা দেখিনি বৌদিদি। সরমা জানে।

—সরমা কই?

—আছে এইখানে। ডেকে দিচ্ছি।

একটু পরেই সরমা এসে গেল। নার্সিং হোমের সব চেয়ে বয়স্কা আয়া। ওকেই দিনরাত রাখা হয়েছিল টুনটুনির জন্যে।

সরমা অদিতিকে দেখেই বলে উঠল,

—এত দেরী করলেন বৌদিদি? মেয়ে তো কেঁদেই অস্থির। কিছুতেই ও, টি, তে যাবে না। বড়দিদি অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে গেছে।

অদিতির মুখটা তখন কষ্টে লাল। যেন এই মাত্র স্নান করেছে, সারা মুখে এমন ঘাম। চোখের কোণে মায়ের স্নেহ-মমতার জল।

—সরমা, তুমি একবার ও, টি, গিয়ে দেখে আসবে? যদি অ্যানাসথেসিয়া না হয়ে থাকে, কাঁদতে বারণ করবে। বলবে আমরা এসে গেছি। লক্ষ্মী ভাইটি—

সরমা চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে বললে,

—দরজা বন্ধ।

অদিতি কোমরে-গোঁজা রুমাল টেনে তার মুখের ঘাম মুছতে মুছতে কেবিনের বিছানায় বসল। সরমা পাখা চালিয়ে দিলে। আমি বোকা এবং অপরাধীর মত দরজার বাইরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললাম,

—আমি নিচে বসছি।

আমার সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছে করছিল অদিতিকে।

—এত ভাবছ কেন? এখন তো আর টুনটুনি কাঁদছে না। এখন সে অ্যানাসথেসিয়ায় অজ্ঞান। তার কোন স্মৃতি নেই। সে ঘুমিয়ে। যখন ঘুম ভেঙে, আমাদের দেখতে পাবে, তখন

আর কাঁদবে না। কিন্তু অদিতিকে কিছুই বললাম না। বললে ও আরো ক্ষেপে যাবে। সিঁড়ি ভেঙে নিচের আপিস ঘরে এলাম।

আপিসে তখন অনেক রুগী। বাঙালী, অবাঙালী। পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ। সব চেয়ার ভর্তি। আমি জানলার সামনে দাঁড়ালাম। সিগারেট ধরালাম। ঝাঁঝালো অথচ মিষ্টি এক ধরনের ওষুধ-ওষুধ গন্ধ নাকে আসছিল। অ্যানাসথেসিয়ার গন্ধটা কী রকম? জানি না। অদিতি জানে। অ্যানাসথেসিয়া করলে কী ভাবে জ্ঞান চলে যায়, স্মৃতি মুছে যায়, জানি না। অদিতি জানে। ভারী অবাক-করা ওষুধ। স্মৃতি মুছে দেয়, আবার নির্দিষ্ট সময়ে ফিরিয়ে আনে।

এই সব ভাবছি। হঠাৎ কে যেন আমাকে ডাকল।

—সুশোভনবাবু। দিদি আপনাকে ডাকছেন।

—কই? কোথায়?

—ঐ যে বুকস্টলে।

—তোমার দিদিকে গিয়ে বল, আমি রাগ করেছি। তিনি কাল রাত্রে আমার অনুরোধ রাখেন নি। গান গাইতে বলেছিলাম, গান নি। যাব না।

—আচ্ছা, আচ্ছা। আজ গাইবে।

—তবুও যাব না। তোমার দিদি নিজে এসে ডাকলে যাবো। তুমি ডাকলে যাব না।

—আমার উপরেও রাগ নাকি আবার?

—জান না, কেন?

—কেন?

—ভুলভুলাইয়ায় গেলে না কাল আমাদের সঙ্গে। অথচ কথা দিয়েছিলে।

—আমার কী দোষ বলুন। দিদি গেলে আমি যেতাম। দিদি রাজী হল না। মা তাই বারণ করলেন একলা যেতে।

—একলা কেন? আমরা এতগুলো লোক, তবু একলা?

—আমি তো একলা। আপনারা চলে যেতেন হোটেলে। আমাকে তো একা ফিরতে হোতো।

—কেন ঈশ্বর বুঝি আমাদের তোমাকে পেঁছে দেবার মত দায়িত্ববোধটুকুও দেন নি?

—চলুন না, দিদি ডাকছেন।

—যেতে পারি, একটা শর্তে।

—বলুন।

—আজ তুমি আমাকে ক্যয়সর বাগে বেড়াতে নিয়ে যাবে?

—আমি আর আপনি, একা একা?

—দুজনে মিলে আবার একা হয় নাকি?

—আপনি তো খুব ছেলেমানুষ। তাছাড়া, আমাকে আপনার কী দরকার? আপনি দিদিকে বলুন বরং।

—আমি শুধু ছেলেমানুষ নই সবিতা। আমি প্রচণ্ড বদ্‌রাগি। তুমি যদি কেবল দিদি-দিদি করো, আর পালিয়ে বেড়াও, আমি এখুনি আমার লোটা-কম্বল নিয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে চলে যাব। তোমার অনেক বয়স হয়েছে সবিতা। বাড়ির ছোট মেয়ে বলে তুমি তো সত্যি ছোট নও। তাহলে বোঝো না কেন?

—কি?

—যা বোঝার।

—আমি কিছু বুঝি না। দিদি আপনাকে ডাকছেন। চলুন না।

—না যেতে চাইলে, হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে পারবে?

—বয়ে গেছে।

—তোমাকে আমার খুন করতে ইচ্ছে করছে।

—কেন? অপরাধ?

—কাল যখন তোমাদের বাড়িতে আমাদের কবিতা পড়ার আসর বসেছিল, তুমি আমার পিছনে বসেছিলে কেন ?

—দিদি তো সামনে ছিল আপনার।

—আবার সেই দিদি ?

আমি যখন রাগে ফুঁসছি, তুমি তখন সাদা ঝর্ণার মত হাসছিলে সবিতা। এখন সব মনে পড়ছে। লক্ষ্ণৌ-এর সেই সব দিন, রাত্রি। সাহিত্যসম্মেলনে গিয়েছিলাম। তোমার বিধবা মা খুব বিদুষী। কবিতা লেখেন, গান গান, সেতার বাজান। আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন তোমাদের বাড়িতে। কবিতার আসর বসেছিল, আমরা কবিতা পড়েছিলাম। তারপর থেকে দশদিনের মেলামেশা। তারপর থেকে লক্ষ্ণৌ-এর সমস্ত সৌন্দর্য মুছে ম্লান হয়ে গেল। ইমামবাড়ার চেয়ে, তুর্কী গেট বা রুমী দরওয়াজার চেয়ে, গোমতী নদীর চেয়ে, সিকান্দ্রা বাগের চেয়ে, তুমিই হয়ে উঠলে সবচেয়ে সুন্দর। তুমি কত সাদাসিধে ছিলে। অথচ তোমার গা থেকে ঘ্রাণ পেতাম আতরের। তুমি চলতে-ফিরতে, মনে হতো কত্থক নাচছো নূপুর পায়ে। তুমি হাসলে মনে হোতো মহফিল।

তুমি তো সেই সবিতা ? আমার জীবনের দশ দিনের জ্যোৎস্না, দশ রাতের ভূমিকম্প ? তোমার কি হয়েছে ? কিসের বিপদ ? অসুখ ? স্বামীর সঙ্গে মন কষাকষি ? ডিভোর্স ? কিসের বিপদ সবিতা ? স্বামী কী করে ? তুমি কি চাকরী করো ? কোথায় ? তোমার কটি ছেলেমেয়ে ? কেন, সুখী নও কেন ? তোমার মত মেয়েও সুখী নয় কেন ? সন্ধ্যেয় ফোন কোরো। সব শুনবো। নিশ্চয়ই শুনবো। আমাকে ক্ষমা কোরো। প্রথমে চিনতে পারি নি বলে। স্মৃতির একেবারে তলায় চলে গিয়েছিলে। আবার একটু একটু করে সব ফিরে আসছে। তোমার মুখ মনে পড়ছে। তোমার দাঁত। তোমার হাত। হাত দেখতে জানি বলে

যা ধরেছিলাম। তোমার ঘাড়ের তিল। তোমার গালের ব্রণ। সব দেখতে পাচ্ছি। বিশ্বাস করো। ভুলি নি। তুমিই তো শিখিয়ে ছিলে অনেক উর্দু শব্দ। এখনো মনে আছে, 'আশিক' মানে, প্রেমিক। আর 'মাশুক'। মাশুক মানে, প্রেমিকা। বিশ্বাস করো, আমি জানতাম তোমার সঙ্গে একশ বছর পরে হলেও দেখা হবে।

রোদে এবং ঝড়ে

মা বলেছিলেন, তুই যদি বেরোস, ঠাকুরপুজোর বাতাসা ফুরিয়েছে, এনে দিস তো সেনু।

মার কথা ফুরোবার পর খুব জোর মিনিট পাঁচেক বইখাতা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছিল স্নেহ। এখন গরমের ছুটি। পড়ার তাড়াও কম। তা ছাড়া অনেকগুলো নতুন চিন্তায় তার মাথাটা দপ্‌দপ্‌ করছে আজকাল। স্নেহ বইপত্তর গুছিয়ে রাখল আলতোভাবে। তারপরই পঙ্খীরাজে চেপে হারিয়ে গেল বাইরের গলানো সোনার মত জ্বলজ্বলে রোদের ভিতরে। পঙ্খীরাজ মানে তার পুরনো সাইকেল। স্নেহর যে-বছর পৈতে হল, তার ছোটকাকা কিনে দিয়েছিলেন ভালবেসে।

বাজারে এসে রাখাল ময়রার দোকানের খুঁটিতে সাইকেলটা ঠেকিয়ে স্নেহ হাটের এদিক-ওদিক অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করল। চেনা-জানা দোকানে ঢুকে চেনা-জানা লোকদের সঙ্গে টুকটাক হাসি-ঠাট্টা করে আরও কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিল সে। স্নেহকে সকলেই ভালবাসে। শুধু এ-অঞ্চলের এক ভদ্র পরিবারের ছেলে বলেই নয়। আজকালকার অন্য দশজন ছেলের চেয়ে ভদ্র বলেও নয়। আর দশটা ছেলের মধ্যে যা নেই, সেই রকম একটা বিচিত্র ধাতুর মিশেল আছে ওর মনের গড়নে, যা খুব স্পষ্ট করে না বুঝেও সকলে সেটা টের পায় বলে।

এ-দোকানে ও-দোকানে হাল্কা হাসি-মশকরা করে ঘুরছিল বটে স্নেহ, কিন্তু তার মনের মধ্যে হাসি ছিল না। একটা অদ্ভুত শূন্যতার উপলব্ধি তার বুকের ভিতরটাকে চেপে ধরেছে কিছুদিন। তার বুক জুড়ে যেন একটা প্রকাণ্ড মাঠ। নানান রকম অতৃপ্তি

আর আকাঙ্ক্ষার রোদে জ্বলছে। নিজেকে পুড়িয়ে ছাই সরিয়ে একটা নতুন স্নেহ হতে চাওয়ার ইচ্ছে। আগের অনেক পুরানো অভ্যেস জীবন থেকে তাই সরিয়ে দিয়েছে সে। যেমন সাঁতার কাটা, ফুটবল খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো। এখন তার কাছে এসব জিনিস উদ্দেশ্যহীন বলেই বাতিল। তার বদলে বই পড়া, আর কবিতা লেখাই এখন তার সর্বক্ষণের সবচেয়ে মূল্যবান কাজ।

একটা গোপন উদ্দেশ্য নিয়েই হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল স্নেহ। মা বাতাসা আনতে না-বললেও বেরোত। মায়ের বলায় আরও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ার সুযোগ পেল সে। এতক্ষণ পাঁচজনের সঙ্গে হাল্কা হাসি-ঠাট্টার আড়ালে সে তার উদ্দেশ্যটাকেই শান দিয়ে দিয়ে ধারালো করেছে। এবার আর কোথাও না-দাঁড়িয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল সে হাটের অনেকটা ভিতরে, ধরণী পোড়ের দোকানের দিকে। আজ শুক্রবার। প্রফুল্ল মাণ্টার আসবে।

ধরণী পোড়ের দোকানটা বড় বিচিত্র। পৃথিবীর এমন কিছু জিনিস নেই যা এখানে সারানো বা মেরামত করা হয় না। বাইরে একটা সাইনবোর্ড রয়েছে। কিন্তু তার সমস্ত অক্ষর উঠে গিয়ে এখন শুধু একটা মরচে পড়া টিনের ফালি। একটু বাতাস দিলেই বিকট শব্দে সেটা দুলতে থাকে। পোড়ের দোকানের জন্যে আজকাল আর সাইনবোর্ডের প্রয়োজনও হয় না। তল্লাট জুড়ে এর নাম। চশমা, রিস্টওয়াচ, স্টোভ, হারমনিয়ম, সাইকেল, মোটর সাইকেল, যার যা ভাঙে, সারাতে ছুটে আসে এই দোকানে। দোকানের ভিতরটা একটু অন্ধকার। যে-দিকটায় বেশী অন্ধকার, সেখানেই একটা চৌকি পাতা। চৌকির উপরে ছেঁড়া চাদর, চাদরের উপরে দু'তিনটে হারমনিয়ম। অন্য দিকে একটা বাঁয়া-তবলা। হারমনিয়মগুলো ধরণী পোড়ের নিজের নয়। খদ্দেররা সারাতে দিয়ে গেছে। কিন্তু বাঁয়া-তবলাটা নিজের। দোকানে

গানের আসর বসে, প্রত্যেক শুক্রবার সকাল-সন্ধ্যায়। রাজপুর গ্রামের প্রাইমারী গার্ল স্কুলের হেডমাস্টার প্রফুল্লবাবু দুবেলা দুবার ছুটে আসেন এখানে চা খেতে। চা খেয়ে দু তিনখানা করে গান গান। ধরণী নিজে বাঁয়া-তবলা নিয়ে বসে। ঐটুকু সময় ধরণী যেন অন্য মানুষ। ভাবে বিভোর হয়ে থাকে তার চোখ-মুখ হৃদয় মন হাত-পা সব কিছু। লোক জমে যায় গানের টানে। গান ছাড়া আরও এটা গুণ আছে প্রফুল্লবাবুর। ওঁর হাতের নক্‌শা খুব সুন্দর। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা বালিশের ওয়াড়, রুমাল, টেবিলের ঢাকা এসবের জন্যে ওঁর কাছ থেকে নক্‌শা আঁকিয়ে আনে।

গানের আওয়াজটুকুর জন্যেই স্নেহর সময় কাটানো। দূর থেকে গানের আওয়াজ পেয়ে যখন দোকানে ঢুকল, সামনে অল্প লোকের পাতলা ভিড়। সকালবেলায় এই রকমই হয়। সন্ধ্যেবেলায় বাড়ে।

ধরণী স্নেহকে দেখতে পেয়েছিল। তবলায় বোল দিতে দিতেই চোখের ইশারায় বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গেই স্নেহকে বসতে বললে। স্নেহ বসল। গান শেষ হলে ধরণী আবার ঘুরে তাকাল স্নেহের দিকে।

—কী খবর বাবু? সারাবার কিছু এনেছেন নাকি?

—না, মাস্টারমশায়ের সঙ্গে একটু কথা বলার ছিল।

—ওঃ, মাস্টারমশাই! এই যে মাস্টারবাবু, আপনার সঙ্গে আমাদের স্নেহবাবু একটু কথা বলবেন। স্নেহবাবুকে চেনেন তো? রতনবাবু, ঐ যে লহরা গ্রামের চক্রবর্তী পাড়ায়—

মাস্টারমশাই চিনতে পারলেন।

—ওঃ, আচ্ছা, তুমি রতনবাবুর ছেলে? বাঃ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে দু চারবার। খুব অমায়িক মানুষ।

ধরণী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল

—স্নেহবাবুও খুব ভাল ছেলে মাস্টারমশাই। উনি আবার কবি। জানেন তো?

—তাই নাকি? তুমিই কবিতা লেখো?

স্নেহ সলজ্জ হাসে।

—কাগজে ছাপা হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কোন্ কাগজে? আমাকে দেখিও তো। বাঃ, খুব আনন্দ হল। আমাদের এই গণ্ডগ্রামের মত জায়গাতেও কবি বলে পরিচয় দেবার কেউ আছে তাহলে! আমার সঙ্গে কী দরকার আছে বলছিলে যেন। কী দরকার বলতো?

স্নেহ যখন ফাজলামি করে তখন একরকম। কিন্তু যখন কবিতা বা সাহিত্য নিয়ে কথা বলে তখন বদলে যায়। বালক বয়সের পক্ষে বেমানান একটা গাম্ভীর্য ওর মুখটাকে ঘিরে ফেলে। স্নেহ ভেঙে ভেঙে, আস্তে আস্তে বলতে থাকে

—আমরা একটা হাতের লেখা কাগজ বের করবো। আপনাকে সাহায্য করতে হবে। আমাদের একটা ক্লাব আছে। সেই ক্লাব থেকেই বের করবো কাগজটা। কলকাতার সাহিত্যিকদেরও লেখা পাবো। চিঠি দিয়েছি। অনেক বড় বড় সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার চিঠিতে আলাপ আছে।

—বল কী? শুনে তো খুবই ভালো লাগছে আমার। তা, আমাকে কী করতে হবে বলতো?

—আপনাকে, আপনাকে আমাদের পত্রিকায় কিছু ছবি মানে নক্শা-টক্শা এঁকে দিতে হবে। আমরা আপনাকে কাগজ রঙ তুলি সব দিয়ে আসবো। আপনি পাতাগুলো এঁকে দিলে তারপর আমরা লেখাগুলো লিখবো।

—তা এঁকে দেবো'খন। তোমরা এত ছোট ছোট ছেলেরা যখন এত বড় একটা উৎসাহ নিয়ে নেমেছো—

২

—কাকীমা, এবার কিন্তু ছাড়ছি না আপনাকে।

—বেঁধে রাখবি নাকি?

—না, বাঁধিয়ে রাখবো। আপনাকে নয় অবিশ্যি। আপনার লেখাকে।

—লেখা? কিসের লেখা রে?

—ওসব শুনবো না। পত্রিকা বের করার সব ঠিকঠাক। আপনাকে লেখা দিতে হবে।

—স্নেহ, বেল খাবে?

—আপনি কথা ঘোরাচ্ছেন কাকীমা! ও-রকম করলে দেখবেন—

—না-খাও তো বাড়িতে নিয়ে যেও, এখানে রইল।

—আমি বুঝি একদম কোলের ছেলে। তিনটে পাকা বেল হাতে গুঁজে দিলেই চুপ করে যাবো? সত্যি বলছি কাকীমা, আপনি যদি লেখা না-দেন, দেখবেন কী করি আমি—

—তোমার কি সত্যি সত্যিই মাথা খারাপ হয়েছে স্নেহ, এ্যাঁ! যাও, বেলা হয়েছে, বাড়ি গিয়ে চান করে খেয়ে-দেয়ে ঘুমোও গে। রোদে ঘুরে মাথাটা গরম করছো। ওঠো দিকিনি।

স্নেহ ওঠে না। হঠাৎ অভিমানে চুপ করে যায়। প্রফুল্ল মাস্টারের সঙ্গে প্রথম আলাপেই সহযোগিতার সাদর আশ্বাস পেয়ে স্নেহ প্রথম ছুটে এসেছে এইখানে। বিভা কাকীমা তার নিজের কাকীমা নয়। ঈষৎ দূর সম্পর্কের কাকীমা। গোটা গ্রামের ঘরে ঘরেই এ-রকম কত কাকিমা মাসিমা পিসিমা ছড়ানো। কিন্তু স্নেহর মনের টান একমাত্র এইখানে। তার যত মনের কথা, যত

বিহ্বল স্বপ্ন, কবি হওয়ার জন্যে তার হৃদয়মনের যত কিছু আকুলতা, সব এই বিভাকাকীমার কাছে।

বিভা শহরের মেয়ে। স্নেহর নলিনীকাকা নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন ভবানীপুরের এই লেখাপড়া-জানা মেয়েকে। বিয়ের সাত বছর পরে টি. বি. হয়েছিল বিভার। বিয়ের সাত বছর পরেও তার গর্ভে সন্তান আসেনি। একসঙ্গে এই দুটো দুরপনেয় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে বিভাকে বেশ কিছু-কালের জন্যে শ্বশুর, শাশুড়ী পরিত্যক্ত বঞ্চিত জীবন কাটাতে হয়েছে বাপের বাড়িতে। স্বামীর সঙ্গেও মনের সম্পর্ক ময়লা হয়ে গিয়েছিল অনেকখানি। দেহের সম্পর্কটা টিকেছিল সাময়িক যাতায়াতের ফলে। তারপরে কোনখানে ঠিক কী ঘটনা ঘটে গেছে কেউ জানে না। বিভার গর্ভে সন্তান আসার তিন বছর পরে সে আবার ফিরে এসেছে তার এই শ্বশুর-বাড়িতে। শ্বশুর মারা গেছেন। শাশুড়ী বৃদ্ধা। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। বিভার হাতে সংসার।

সভ্য আচার-আচরণে অভ্যস্ত শহরের মেয়ে বলেই হোক, অথবা তার জীবন সম্পর্কে কোনো ভ্রান্ত ধারণার প্রতিক্রিয়ার ফলেই হোক, বিভার সঙ্গে গ্রামের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্কটা আজও আলগা আলগা। তাছাড়া পাড়াগাঁয়ের মানুষের মনে টি বি নামের ভয়াবহ ব্যাধিটাও ভূত-প্রেতের ভয়ের মত একটা বদ্ধমূল সংস্কার।

স্নেহর সঙ্গে বিভার ঘনিষ্ঠতা খুব বেশী দিনের নয়। স্নেহরা যেবারে গ্রামের বন্ধ এবং ভাঙা লাইব্রেরীটা নতুন করে চালানোর দায়িত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে নিলে, তারপরই। বিভা নিজেই একদিন স্নেহকে ডেকে বলেছিল,—তোমাদের লাইব্রেরীর মেম্বার হতে হলে কী লাগে?

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। অনেক সদস্য বেড়েছে

লাইব্রেরীর। কিন্তু মহিলা সদস্য রয়ে গেছে ঐ একজনই, বিভা।

আজকাল স্নেহ নিজেই বই বেছে নিয়ে আসে। ফাঁকি দেবার ফুরসৎ পেলে বিভার কাছে বসে কলকাতার গল্প শোনে। বিভা গল্প বলে সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। হাসির জায়গায় হাসি। দুঃখের জায়গায় দুঃখ। স্নেহ কিন্তু সবকিছুর মধ্যে একটা অনির্বচনীয় দুঃখের স্বাদ পায়। স্নেহ জানে, অনেক আটপৌরে কথার আড়ালে বিভা ঢেকে রাখছে তার আসল মর্মবেদনা। স্নেহ বিভার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। কিন্তু তার চেতনা এবং অনুভবের ক্ষমতা বয়সের চেয়ে বেশী। বিভা যে-কথা মুখে বলে না, নিজের ভাবনা দিয়ে সেটা ভরিয়ে স্নেহ নিজের মধ্যে একটা কষ্টের পরিমণ্ডল তৈরী করে নেয়।

উঠবো উঠবো করেও স্নেহ চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারছিল না। কেমন একটা হেরে-যাওয়া মনোভাব ভেতরে ভেতরে বেপরোয়া করে তুলছিল তাকে। পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষেরই কিছু নির্দিষ্ট করা আপনজন থাকে। যত আদর-আব্দার, স্নেহ-ভালবাসা, উৎসাহ-উদ্দীপনার দাবী সেইখানে, সেইখানে এতটুকু বেসুরো কিছু বাজলে, বন্ধ ছাতার মত মনটা গুটিয়ে আসে।

—তোমার মা কোথায় ?

বিভার আট বছরের ছেলে, কাতু, বাইরে খেলাধুলা করে ঘরে ফিরল। চোখ-মুখ রোদে লাল। স্নেহ কাতুকে কাছে নিলে দু'হাতে।

—মা, রান্নাঘরে।

কাতুর মাথায় সাহেবদের মত ফিনফিনে সোনালী চুল। ঘামে ভিজে অদ্ভুত একটা গন্ধ। কাতুকে কাছে পেলেই স্নেহ তার চুল নিয়ে ঘাঁটে।

—তোমার মাকে গিয়ে বল, আমি চলে যাচ্ছি।

ঠিক সেই সময়েই বিভা দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। স্নেহ বিভার দিকে চোখ তুলে তাকাল না।

—আমি জানি, চা না-খেয়ে তুমি উঠবে না।

—মোটেই না। আমি কি চায়ের কথা বলেছি একবারও।

স্নেহর লুকনো অভিমান রাগ হয়ে ফুটে বেরোয়।

—ন-বললেও আমি শুনতে পাই।

—তা তো পাবেনই। যেটা বলি না সেটা আপনি শুনতে পান। আর যেটা বলি সেটা আপনার কানে ঢোকে না। চা, খাব না।

—চা খেয়ে নাও বলছি। ফাজলামি কোরো না।

—কি ফাজলামি কোরলাম আমি ?

—তুমি তো খানিকটা ফাজিল হয়েছই আজকাল। ফাজিল না-হলে তোমার বুদ্ধি থাকতো। আমার কাছে এসে কবিতা চাইতে না। আমি একটা পাড়াগাঁয়ের বৌ। আমি কবিতা দেবো, আর তোমরা সেটা প্রকাশ করবে ? পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে যাবে না ?

যায় যাবে, তাতে কার কী ? আপনার কী ক্ষতি হবে তাতে ?

—স্নেহ, চা-টা খেয়ে নাও। গরম চা না খেলে তোমার মাথা ঠাণ্ডা হবে না।

খাব না খাব না করেও স্নেহ চা-টা খেল। চা এ-গ্রামে কয়েকটা আঙুলে গোনা বাড়িতেই হয় কেবল। স্নেহদের বাড়িতে হয় না। স্নেহর চায়ের নেশা বিভার কাছ থেকেই। চা-খেয়েই স্নেহ উঠে দাঁড়াল।

—আর আসছি না। দেখবেন—

সত্যি সত্যি কাঁদো কাঁদো গলায় এই কথাগুলো বলে স্নেহ দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল। কাতু বিভাকে জিজ্ঞেস করলে,

—কাকু রাগ করল কেন মা ?

—তোমার কাকু অমনিই।

৩

সাইকেলে চেপে স্নেহর মনে পড়ল, বাতাসার ঢোঙাটা বিভার ওখানে ফেলে এসেছে। আবার ফিরে যাবো? না। ফিরে গেলে বিভাকাকীমা ভাববে আমার ব্যক্তিত্ব নেই। বাড়িতে গিয়ে বরং ছোটভাইকে পাঠিয়ে দেবো। তাহলে কি এখন বাড়ি ফিরছি? না। কোথায় যাবো? নান্তুকে খবরটা দিয়ে যাই, প্রফুল্লবাবু রাজী হয়েছেন। এবার সব তেড়েফুঁড়ে লেখার জোগাড়ে লেগে যাও। আর ক্লাবের একটা জরুরী মিটিং কল করতে হবে এখন।

তা, শম্ভুর কাছে না-গিয়ে নান্তুর কাছে যাওয়া কেন এর জন্যে? নান্তু তো ক্লাবের একজন সাধারণ সদস্য। শম্ভু সেক্রেটারী।

স্নেহর ভার-ভার মুখেও হাসি এসে গেল।

আমার কি তবে এখন শুধু হারার পালা?

নান্তু স্নান করছিল। ঠিক স্নান নয়। শুকনো নারকেল নিয়ে ওয়াটার পোলো খেলছিল চার পাঁচজন মিলে, মাঝ-পুকুরে। স্নেহকে দেখেই নান্তুরা চীৎকার করে ডাক দিল—

—এ্যাই স্নেহ, নেমে আয়।

দেয়ালের গায়ে সাইকেল ঠেকিয়ে রেখে স্নেহ নড়বড়ে কাঠ-বাঁধানো ঘাটের একটু শুকনো জায়গা বেছে নিয়ে বসল।

—কীরে, নেমে আয় না।

স্নেহ হাত নেড়ে না জানাল।

মাঝ-পুকুর থেকে জলভরা মুখে বিকট আওয়াজ করে নান্তু বললে—

—এ্যাই বিশে ওকে টেনে নামাতো জলে।

দু' হাতে জল ছিটোতে ছিটোতে বিশু সত্যিই তেড়ে আসতে লাগল স্নেহর দিকে। স্নেহ উঠল না। কিন্তু বিশু যখন খুব

কাছাকাছি এসে জল ছিটোতে লাগলো জলের উপর হাতের তালু ঢাঁ-ঢাঁ শব্দ করে, জামা-কাপড়ের খানিকটা ভিজে গেলে, স্নেহ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। সরে গেল পিছনে।

—এ্যাই বিশু, কী হচ্ছে রে?

পিছন থেকে মেয়েলী গলায় আওয়াজ শুনে পিছন ফিরে তাকাল স্নেহ। জুলি দাঁড়িয়ে আছে জানালায়। স্নেহ তাকাতেই মুচকী হেসে সে বলল

—মা তোমাকে ডাকছে ভিতরে।

—মাসীমা কী করে জানলেন, আমি এসেছি?

—অত জোরে সাইকেলের বেল বাজালে সকলেই শুনতে পায়।

—পায় বুঝি? সকলেই পায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—জানা রইল।

—জেনে জেনে তুমি তো একেবারে পণ্ডিত। ভিতরে এসো না।

স্নেহ পা বাড়ালো ভিতরে।

দোতলায় ওঠার সিঁড়ির কাছেই জুলির বাবা খেতে বসেছেন। জুলির মা, তাঁর সামনে বসে। স্নেহকে দেখেই স্নেহের কিশোরী-দাদু বলে উঠলেন,

—এই যে লাটসাহেব, এখনো রোদে রোদে ঘোরা হচ্ছে? কী রাজ্যজয় করা হচ্ছে হে? এ্যাঁ? একবারে গোল্লায় যেতে বসেছে সবকটা।

এইরকম রসকসহীন রুক্ষভাষণই এঁর চরিত্র। স্নেহ কখনো ঝগড়া করে, কখনো কানেই তোলে না কথা। দিদিমা বললেন—

—হ্যাঁরে, তুই যে আর আসিস না আজকাল? ভুলে গেলি নাকি?

জুলি দাঁড়িয়েছিল দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মাঝখানে। জুলি বললে—

—ওরে বাঃ বাঃ, উনি আজকাল কত বড় হয়েছেন। উনি কখনো ওঁর গরীব দিদিমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে পারেন? কত ডাকাডাকি, সাধাসাধি করতে, তবে এলেন।

—না দিদিমা, সব মিথ্যে কথা। বাস্তায় ঘাটে দেখা হলে উনি কথাই বলেন না, আবার আমার নামে বলা হচ্ছে।

স্নেহ কথাটা বললে জুলির দিকে তাকিয়ে। জুলি দেখতে পেল স্নেহর মুখে অভিমানের মেঘ। মুখে আঁচল-চাপা দিয়ে চোখে দুষ্টুমিভরা হাসি ফুটিয়ে সে বলল

—উপরে আসুন-না একবার। আপনার মামী এসেছেন।

মামী মানে মান্তুমামার বৌ। খুব অল্পদিন বিয়ে হয়েছে মান্তুমামার। বিয়ের পরই বিদেশে চলে গেছেন। দেরাদুন না কোথায় যেন। মিলিটারী চাকরি। মিলিটারী হবার মত চেহারাও বটে। অথচ তারই ভাই নান্তু কেমন যেন কাটখোট্টাই।

স্নেহ ভাবছিল উপরে যাবে কি যাবে না। বিয়ের পর দু'চার দিন মাত্র দেখেছে এই নতুন মামীকে। খুব একটা ভাল লাগেনি স্নেহর, সব সময় মাথায় ঘোমটা টানা। সব সময় একটা বৌ-বৌ ভাব। মাথা ভর্তি সিঁদুর। এইসব দেখলে স্নেহ ভাবে, আমাদের গ্রামটা আর মানুষ হোল না। এমন একটা মেয়েকে কেউ বিয়ে করে আনতে পারল না, যাকে বলা যেতে পারে খানিকটা আধুনিক।

স্নেহ দোতলায় যাওয়ার জন্য যেই একটু পা বাড়িয়েছে কিশোরীদাদু ধমক দিয়ে উঠলেন

—এ্যাই, বাড়ি যা তো। চান-খাওয়া নেই তোদের। ঐ একটা ছেলে সেই কখন থেকে পুকুরে নেমেছে। ওঠার নাম নেই। আর ইনি হয়েছেন, দলের সর্দার। ট্যাং-ট্যাং করে কেবল রোদে ঘুরে ঘুরে মোড়লী করে চলেছেন। যাঃ, বাড়ি যা।

কিশোরীদাদু চেঁচিয়ে উঠল বলেই স্নেহর ভেতরে চাপা জেদ চেপে গেল। মুখে হালকা ভাব ফুটিয়ে স্নেহ বলল

—আহা, মামী এসেছে একটু প্রণাম করে যাই।

দোতলাই উঠেই স্নেহ জুলির হাতটাকে শক্ত করে চেপে ধরলে।

—খুব ডাঁট বেড়েছে, না ?

—কেন রে ?

—কেন রে ? সেদিন তালবাগানের কাছে কতবার করে ডাকলুম সাড়া দিয়েছিলে ? ফিরে তাকালে না পর্যন্ত।

—ও-রকম করে রাস্তায় চেঁচিয়ে ডাকলে কোনদিন ফিরে তাকাব না। তালবাগানে এক পুকুর লোক। তার মধ্যে বাবুর রসিকতা। লোকে কী ভাবতে পারে, সে ভয় নেই।

—লোকে কী ভাববে ? আমি তো আমার মাসীকে ডাকছি।

—আহা, কী একেবারে মাসী-দরদী। শয়তান কোথাকার।

জুলির চাপা গলায় কথা, চাপা ঠোঁটের হাসি, তার রোগা রোগা শরীরেও চাপা না-পড়া ষোল বছর বয়সের গড়ন, স্নেহের মনে একই সঙ্গে জাগিয়ে তোলে ভালবাসা এবং রাগ। স্নেহের ইচ্ছে করে জুলিকে দুটো হাতের মধ্যে পিষে এখুনি ভেঙেচুরে একটা তালগোল পাকিয়ে দেয়। স্নেহ স্থির এবং উজ্জ্বল দৃষ্টিতে জুলির ফিক্‌ফিক্ করে হাসা মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে, তুমি এমন কিছু সুন্দরী নও। বুঝলে ? তোমার মধ্যে এমন কিছু নেই, যা চিরকাল মনে রাখার মত। এক মুহূর্তে তোমাকে আমি দূরে সরিয়ে দিতে পারি। ভালবাসা অথচ ভালবাসা নয়, এমনি একটা জোড়াতালি দেওয়া সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলেই, সেটাকে নিয়ে খানিকটা মেতে থাকা।

—আঃ, লাগছে হাতটা ছাড়বি তো।

—না।

—দেখবি, চেঁচিয়ে ডাকবো মাকে—

জুলি মাকে চেঁচিয়ে ডাকার মতো একটা মিথ্যে ভঙ্গি ফুটিয়ে তোলে মুখ হাঁ করে। স্নেহ হাতটা ছেড়ে দেয়।

—দেখছ, কী রকম দাগ বসে গেছে আঙুলের।

—কেটে রক্ত পড়লে, খুব ভাল হত। আমি শয়তান কিনা!

জুলি জোরে পা চালিয়ে দোতলার বারান্দার শেষ প্রান্তে তার বৌদির ঘরে ঢুকে পড়ে। স্নেহ পিছনে পিছনে ঢোকে। ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে যায় স্নেহ। এই তার নতুনমামী। এও কি সম্ভব? মাত্র ক'মাসের মধ্যে এত বদলাতে পারে মেয়েরা। ঘোমটা দেওয়া অবনত একটা কুঁড়ি যেন ফুটে উঠেছে ঘোমটা খসিয়ে, ঊর্ধ্বমুখী ফুল।

৪

—বাঃ বাঃ, চেহারাখানা যা বানিয়েছ রোদে ঘুরে ঘুরে, আর দেখতে হবে না। হ্যাঁরে, ভগবান কি তোদের খিদে-তিষ্টেও দেননি। ঘড়িতে দেড়টা বেজে গেছে। এত বেলা পর্যন্ত কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলি?

স্নেহ সাইকেলটা ধানের মাচার গায়ে ঠেকিয়ে রেখে লাফাতে লাফাতে উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় উঠে গায়ের জামা খুলতে লাগল।

—জানো মা, শিউলীমামী এসেছে।

মায়ের কাছ থেকে কোনো সাড়া পেল না স্নেহ। চান করে যখন খেতে বসল সে, স্নেহর মা খানিকটা দূরে বসে প্রতিবেশী চাষীর বৌ মঙ্গলের মার সঙ্গে কথা বলছিলেন। স্নেহ আবার বলল

—জানো মা, শিউলীমামী এসেছে। এমন চেহারা হয়েছে, যে চেনাই যায় না।

—কবে এসেছে?

—তিন চার দিন হল। যেমন দেখতে হয়েছে, তেমনি গা-ভর্তি গয়না।

মঙ্গলার মা জিজ্ঞেস করে—

—কে গা দিদি।

—ঐ যে আমার সেজমাসী আছে না, তারই বড়ছেলের বৌ। বারুইপুরের মেয়ে। বাপের বাড়ি বেশ বড়লোক। মেয়েকে খুব গয়না-গাটি দিয়েছে আর কী।

স্নেহর ছোটবোন সীতু কোথায় ছিল, এক দৌড়ে মায়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

—কে মা ? কাকে গয়না-গাটি দিয়েছে ?

মায়ের বদলে স্নেহ মুখ থেকে মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে বলে

—আরে শিউলীমামী এসেছে না—

—তুই গেছলি বুঝি জুলিমাসীদের বাড়ি ?

—না-গেলে আর দেখলাম কী করে ?

—মা, আমি যাব ?

স্নেহর ছোটভাই রুনু এই সময় দোতলার সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে আসছিল। স্নেহ তাকে ডাকল, হাত নেড়ে। রুনু কাছে এলে স্নেহ চুপি চুপি, মায়ের কান এড়িয়ে বললে—

—বিভাকাকীমার ওখানে বাতাসার ঠোঙাটা ফেলে এসেছি, তুই বিকেলে খেলে ফেরার সময় নিয়ে আসবি। কেমন ?

রুনু কথা শেষ হতে-না-হতেই ছিটকে বেড়িয়ে গেল বাইরে, ঘাড় নেড়ে একটা হ্যাঁ জানিয়ে।

—ওমা, বল না, যাব ?

মঙ্গলার মা একটানা বকে চলেছে, একাই। স্নেহর মা শুধু শ্রোতা। আর ক্রমাগত ঘাড় নেড়ে চলেছেন। ঠিক যেন যন্ত্রের মত। তালে তালে। সীতুর কথা মায়ের কানে যায় না। সীতু স্নেহর দিকে তাকিয়ে বিরক্ত মুখে হাসি ফুটিলে বলে—

—দেখছিস দাদা। এখন হাজার ডাক্ শুনতে পাবে না। কী রকম দেখলি রে দাদা? খুব সুন্দরী হয়েছে শিউলীমামী?

—দারুণ। বিয়ের সময় কেমন যেন একটা জড়ভরত জবুথবু, ভাব ছিল না? এখন একদম আলাদা। লম্বা হয়ে গেছে হাত খানেক। প্রায় আমার মাথার সমান সমান। আমি বেশী কথা বলিনি। পরে আসবো, এই বলে পালিয়ে এসেছি।

সীতু এবার মায়ের হাতটা ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দেয়।

—কতবার বলছি, শুনতে পাচ্ছ না। যাব?

—কোথায়?

—শিউলীমামীকে দেখতে।

—যা।

সীতুর দিকে না তাকিয়েই উত্তর দেন তিনি। সীতু লাফাতে লাফাতে দোতলায় উঠে যায়, শাড়ি পাল্টাতে। খাওয়া শেষ স্নেহর। মায়ের ঘরে ঢুকে প্যানের ডাবর খুলে কয়েক কুঁচো সুপুরী মুখে দিয়ে নিজের শোবার ঘরে চলে আসে স্নেহ।

নিজের মনের মধ্যে স্নেহ আজ কী রকম একটা সাড়া পাচ্ছে। কবিতা লেখার আগে প্রত্যেকবারই এমনি একটা তোলপাড় জাগে। কোন একটা ভাবনা স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে না অনুভূতির ভিতরে। কোনো একটা সুখের দৃশ্য ভাবতে গেলে, তার ভিতর থেকে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে কোন একটা দুঃখের ছবি। আনন্দ কি বেদনা এদের আলাদা করে চেনা যায় না। সব কিছুই দুঃখ হয়ে ওঠে। সব কিছুই ভীষণ জ্বরের মত কেবল বাড়িয়ে যায় মনের শূন্যতার তাপ।

স্নেহ ভাবছিল কলম নিয়ে বসলেই কবিতা আসবে। অথচ অবেলায় স্নান-খাওয়ার ফলে তার শরীরে মিশে ছিলো ক্লান্তি। স্নেহ তাই নিজের পড়ার ঘরে না-বসে শোবার ঘরে চলে এল। মাথার বালিশটা বুকে চেপে খাতার পাতায় কলম ছুঁইয়ে চুপ

করে বসে রইল কিছুক্ষণ। একটু পরে আধশোয়ার মত শুয়ে পড়ল। গরম বাতাসের ঝাপটা এসে গা পুড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। স্নেহ ভাবল জানলাটা বন্ধ করে দেবে। জানলা বন্ধ করলে, রোদের তাপটা কমবে, কিন্তু ঘরে আলো আসবে না। স্নেহ তাই উঠল না। একটু আগে পর্যন্ত স্নেহ এই আগুনের মত রোদে ঘুরে বেড়িয়েছে কত স্বচ্ছন্দে। এখন তার কাছেই রোদটা অসহ্য।

কুঁড়ি, কুঁড়ি, ফুল, ফুল, ঊর্ধ্বমুখী, ঊর্ধ্বমুখী ফুল, কুঁড়ি থেকে ফুটে-ওঠা ঊর্ধ্বমুখী ফুল, ঊর্ধ্বমুখী সূর্যমুখী, নতুনমামী, কেবল নতুনমামীর মুখটাই মনে পড়ছে, চোখ দুটো, সেণ্টের গন্ধ ঘর জুড়ে, গন্ধটা যেন নতুনমামীরই গায়ের, এখান থেকে নতুনমামীকে মনে করলেই ঐ গন্ধটা নাকে আসবে। প্রত্যেক মানুষের একটা নিজস্ব গন্ধ আছে। যেমন? যেমন বিভা-কাকীমারও।

বিভাকাকীমাদের বাড়ি পুরনো আমলের। প্রায় জমিদার-বাড়ি। এখন ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে, অযত্নে অবহেলায়, সব কিছুর ওপরেই মলিনতার ছাপ। তবু বাড়ির গড়নটা তো রয়ে গেছে। বিভাকাকীমাদের মত ঢাকা-বারান্দা আর কোন বাড়িতে নেই। ভেতরটা সেইজন্যেই একটু অন্ধকার। আর অন্ধকার বলেই শীতল। আর ঐ শীতল আবছা অন্ধকারের সঙ্গে মিশে থাকে একটা গন্ধ। বেলের গন্ধ। বিভাকাকীমাদের অনেক বেল গাছ। পাকা বেলের একটা স্থায়ী গন্ধ তাই জড়িয়ে থাকে বাড়ির সবখানে। ভিতরের ঘরগুলো আরো অন্ধকার বলে আরো রহস্যময়। স্নেহর খুব ইচ্ছে করে ঐ অন্ধকারের সবটুকুকে হাতড়ে দেখে। কিছু-না-কিছু পরমাশ্চর্য হাতে এসে যাবেই। বিভাকাকীমা সব সময়েই হাসিখুশী অথচ চোখের কোণে কী রকম কালিপড়া। কত কিছু যেন লুকনো রয়েছে চোখে। ধরা যায় না।

যাঃ, কবিতাটা কোথায় হারিয়ে গেল, বেশ মনে আসছিল, *কুঁড়ি, কুঁড়ি, অলৌকিক চাবি থেকে খুলে গেল, খুলে গেল,* অলৌকিক চাবি, আশ্চর্য এই অদ্ভূত শব্দ দুটো হঠাৎ মনে এল কেন, নতুনমামীর আঁচল তো চোখে পড়েনি, চাবি থাকে বিভাকাকীমার আঁচলে, বিয়ে হয়ে গেলেই মেয়েদের আঁচলে চাবি কেন, বিয়ে হয়ে গেলেই মেয়েরা বুঝি সব সোনার সিন্দুক, ডাকাতির ভয়ে তালা আঁটা, চাবি আর সিন্দুক, ইস, কী মার খেয়েছিলুম, এখনো মনে পড়ে, মায়ের হাতে, মা ঘুমোচ্ছিলেন, আঁচলের গিঁট থেকে চাবিটা সরিয়ে সিঁড়ির ঘরের অন্ধকার কোণে আবহমান পড়ে থাকা সিন্দুকটা খুলেছিলুম, সিন্দুক ভর্তি শাড়ি, লাল, নীল, সবুজ, সোনালী বেনারসী, যেন একটা স্বপ্নের রাজত্ব, তারই এক কোণে বিরাট এক বাণ্ডিল চিঠি, বাবাকে লেখা মায়ের, মাকে লেখা বাবার, মা কিছু কিছু চিঠি লিখেছিলেন কবিতায়, বেশ ছন্দ মিলিয়ে, তবে বড্ড সেকেলে, তবু তো কবিতা, হয়তো মায়ের কাছ থেকেই কবিতার ব্যাধি এসেছে আমার রক্তে, ইস, কবিতাটা হারিয়ে গেল, হবে না আজ, কী যেন শব্দটা, অলৌকিক চাবি, ওরকম একটা চাবি, থাকলে, বিভাকাকীমার শোবার ঘরটা বড় অন্ধকার, কত সুটকেস, আর সিন্দুক, এসব কে খোলে, কখন খোলে, লুকিয়ে রাখার, গোপন করার কী এত জিনিস থাকে মেয়েদের, ঘোমটা, আঁচল, সিন্দুক, শাড়ি, জরী বসানো বেনারসী, ন্যাপথলিন। হাসছ? তোমার খুব হাসি পাচ্ছে জুলিমাসী, তাই না? হেসে আর পালিয়ে আর বার বার বুকের আঁচল টেনে তুমি নিজেকে ভারী রহস্যময়ী বানাতে চাইছো, মনে আছে গত বছর বিজয়ার দিন সিদ্ধি খেয়ে, সে তো শুধু সিন্দুকের ডালায় হাত, এবার পৃথিবীর যেখানে যত সিন্দুক, তার ভেতরটাকে উপড়ে উপড়ে···

—দাদা, এ্যাই দাদা, দা দা আ-আ-আ।

স্নেহ কষ্ট করে চোখ মেলে তাকায়।

—বাবা, এখনো ঘুমোচ্ছ? উঠে দেখো, সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

—*সন্ধ্যে হয়ে গেছে? সে কি রে? কখন ঘুমিয়ে পড়লাম* আমি?

—তোমার একটা চিঠি আছে। এই নাও। আর বিভা-কাকীমার ওখানে গিয়েছিলাম। তোমাকে যেতে বলেছেন। তিনটে বেল দিয়েছেন আমাদের জন্যে।

—চিঠিখানা কই?

—ঐ তো।

স্নেহ ঘুমভরা চোখটাকে হাতের তালুতে দ্রুত চটকে নিয়ে বড় বড় করে চিঠিটার দিকে তাকায়। ঘরের ভিতরটা অন্ধকার। লাফিয়ে খাট থেকে নেমে বারান্দায় চলে আসে। খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বের করে। বারান্দার আলোও আবছা। স্নেহ চেষ্টা করেও পড়তে পারে না। শুধু বুঝতে পারে চিঠির কালিটা সবুজ।

—মা, আলো জ্বেলেছ? এ্যাই সীতু···

স্নেহ দোতলা থেকে নিচে নেমে আসে। কারো সাড়া পায় না। সারা বাড়িটা স্তব্ধ। আর আবছা। রাবার-ঘসা লেখার মত অন্ধকারে যেন মুছে গেছে অনেকখানি। সন্ধ্যের সময়টা প্রতিদিনই এমনই হয়। ঘুমোবার আগে, স্নেহের বাবা মশারীর মধ্যে বসেই মনে মনে কী যেন মন্ত্র পাঠ করেন। সন্ধ্যের সময় পৃথিবীটাও যেন অমনি মন্ত্রপাঠ করে নীরবে। তবে পৃথিবী কখনও একেবারে নীরব থাকে না। পুকুরপাড়ের আম গাছে এক ঝাঁক পাখি একটানা চিলিক-মিলিক চিলিক-মিলিক শব্দে বাতাসকে মাতিয়ে তুলেছে। হয়তো এও এক মন্ত্রপাঠ।

—মা-আ-আ। রুনু-উ-উ-উ। অনু-পিসীই-ই-ই। সীতু-উ-উ-উ।

কোনখান থেকেই সাড়া আসে না।

হাতের খোলা চিঠিটা এখুনি পড়তে না-পারলে স্নেহর স্বস্তি নেই। একবুক অস্থিরতা নিয়ে গোধূলি-পেরনো ধূসর অন্ধকারের ভিতরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে স্নেহ।

একটু পরেই মা বেরিয়ে আসেন গোয়ালঘরের দিক থেকে। হাতে লম্ফের আলো। বাতাসে শিখাটা কাঁপছে। হাত দিয়ে বাতাস আড়াল করে মা কাছাকাছি এগিয়ে আসতেই স্নেহর রুক্ষ প্রশ্ন—

—কী ব্যাপার বল তো। কাউকে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না।

—কে আছে যে সাড়া দেবে? সীতু আর অনু তো চলে গেছে সেজমাসীর বাড়ি। রুনু আসছে যাচ্ছে। তুমি তো ঘুমোচ্ছিলে।

—আমাকে একটা আলো জেবলে দাও।

—দাঁড়া, দাঁড়া। জেবলে দাও বললেই জেবলে দেবো, আমার কি দশটা হাত? দেরী হবে। তুলসীমঞ্চে এখনো প্রদীপ দেওয়াই হোল না।

আলো যখন জবলল ততক্ষণে অনুপিসি আর সীতু ফিরে এসেছে। ওরা সারা বাড়ি কলকলিয়ে কী সব বলাবলি করছিল। স্নেহর ওদের কথায় কান নেই। একটা হারিকেন নিয়ে নিজের পড়ার ঘরে চলে যায় সে। আলোর সামনে মেলে ধরে হাতের চিঠি।

প্রীতিভাজনেষু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি যে পত্রিকার নাম করেছ, তা আমার চোখে পড়েনি। যদি কখনো হাতে পাই নিশ্চয়ই তোমার কবিতা পড়বো। নিজের সম্পর্কে তোমার যখন আত্মবিশ্বাস আছে, কেন বড় হতে পারবে না, নিশ্চয়ই পারবে।

তুমি তোমাদের হাতে লেখা পত্রিকা জাগরণে-এর জন্য আমার একটা যে কোনো রকম লেখা চেয়েছ। কতটা সম্ভব হবে জানি না। তবে চেষ্টা করবো।

তোমাদের পত্রিকার জন্যে শুভেচ্ছা আমার আছেই। কালো কালির অক্ষরে অক্ষরে তোমাদের সবুজ মনের দীপ্তি, সকালবেলার রোদের মতো ফুটে উঠুক, এই কামনা রইল।

ইতি

প্রীতিসহ

নরেন গঙ্গোপাধ্যায়

সবুজ কালিতে লেখা চিঠিখানা স্নেহ বার তিনেক পড়ল। তার সমস্ত মন ছাপিয়ে উপচে পড়ছে এক দুঃসহ আনন্দ। ইচ্ছে করল চিঠিখানাকে পতাকার মত উঁচু করে উড়িয়ে জানাশোনা জগৎটার ভিতরে এখুনি ছুটে যায় সে। তারা অবাক হয়ে দেখুক, তার হাতে বাংলা সাহিত্যের একজন রাজার লেখা চিঠি।

৫

—কে? কে গান গাইছে, কে? এ্যাঁ?

নিচের উঠোনে কিশোরীদাদুর তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠস্বর।

মুহূর্তে নান্তুদের বাড়ির দোতলার পূর্বদিকের শেষ ঘরখানার প্রাণস্পন্দন মরে গেল যেন বজ্রাঘাতে। ঘরের মধ্যে ছিল স্নেহ, জুলি আর শিউলীমামী। জুলির হাত ছিল স্নেহর হাতে। সেটা ছিটকে সরে এল। শিউলীমামীর মাথার ঘোমটা ছিল খোলা। গান থামিয়েই সে মাথায় ঘোমটা টেনে মুখখানাকে ফাঁসীর আসামীর মত মলিন করে ঘুরে বসল। ভাবখানা এমন যেন শ্বশুরমশায় একদম সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

একটু পরেই আবার সেই কর্কশ স্বর—

—কী হল? কে আছে উপরে? সাড়া দিচ্ছে না কে।? কে-এ-এ?

ভয়ে ভয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল জুলি।

—কে, গান গাইছিল কে?

—বৌদি।

—আর কে আছে ঘরে?

—কেউ না। আমি আর বৌদি।

—বাড়ির বৌ-এর এত গান গাইবার কী দরকার? এ্যাঁ? ওসব গান-ফান ভুলে যেতে বলে দাও। ওসব যেখানে চলে সেখানে চলে। আমাদের বাড়িতে নয়।

জুলি ঘরে ফিরে এল মুখে করুণ হাসি ফুটিয়ে। ঘরে ঢুকেই দরজাটা দিলে ভেজিয়ে। স্নেহ বোকার মত জুলির দিকে তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল—

—দাদু আবার উপরে আসবে নাতো?

—না।

—আমি বেরুবো কী করে?

—চুপ করে বসে থাক। আর-একটু পরে বাবা পুজোয় বসবেন। পালিয়ে যাবি তখন।

স্নেহর মনটা তেতো হয়ে যায়। একটা অপূর্ব মুহূর্ত গড়ে উঠেছিল। গানের প্রভাবেই হয়তো আজ জুলি তাকে কত সহজে বসতে দিয়েছিল গায়ের কাছে। প্রথমে দূরে দূরে ছিল। গানের মাঝখানে যেন বসতে কষ্ট হচ্ছে এমনি ভঙ্গি ফুটিয়ে তক্তাপোশের বাইরে অর্ধেকটা পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছিল স্নেহ। জুলির কোমরের কাছে স্নেহ। গানের তালে তালে জুলির আঁচল ধরে টানছিল। জুলি তখন নিষেধ জানানোর জন্যেই বাড়িয়ে দিয়েছিল হাতটা। স্নেহ সেই হাতটাকে তুলে নিয়েছিল নিজের

মুঠোয়। জুলি হাত সরিয়ে নেয়ান। আধফোটা পদ্মফুল পেলে তার বোজানো পাপড়িগুলো যেমন করে খুলতে চায় মানুষের স্বভাব, ঠিক তেমনি করেই জুলির হাতের পাঁচটা আঙুলকে নিয়ে খেলা করছিল স্নেহ।

নতুনমামীর জন্যে অদ্ভুত একটা মমতা জেগে উঠল স্নেহর মনে। নতুনমামীর অপমানকে সে নিজেও ভাগ করে নিতে চাইলো। যতক্ষণ নতুনমামী গান গাইছিল, কী অপূর্ব একটা সুষমা ফুটে উঠেছিল তার মুখে। এখন ঘোমটার আড়ালে নতুন-মামী আবার ঘরের কোণের বৌ। বৌ নয়, যেন একটা জীবন্ত পুতুল। যার নিজের হাত-পা নাড়ার স্বাধীনতা নেই।

জুলি তার বৌদির দিকে তাকিয়ে বলল—

—বৌদি আমি বরং চলে যাই। আলোটালো জ্বালবার সময় হয়ে এল। এখুনি মা ডাকবে।

যাবার আগে স্নেহর দিকে তাকিয়ে বলল—

—কথা-টথা বলিস না যেন একদম।

জুলি চলে গেল দরজা ভেজিয়ে। বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। ঘরটা ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে। জানলা দিয়ে দূরের যে ছড়ানো বাগানটা তার সমস্ত জেল্লা নিয়ে চিক্‌চিক্‌ করছিল বিকেলের রোদে, এখন ঘন কালো। ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে পাখিদের কোলাহল। পৃথিবী জুড়ে যেন একটা ভীষণ শোক নেমে আসছে অন্ধকার হয়ে। অন্ধকারে চক্‌চক্‌ করছে নতুন-মামীর কানের দুল, হাতের চুড়ি, গলার হার। একটা স্নিগ্ধ মৃদু সুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে স্নেহর চারপাশে। না, সেন্টের গন্ধ নয়। নতুনমামীর চুলের গন্ধ। স্নেহ একটু ঝুঁকে বসল নতুন-মামীর কাছাকাছি।

—আপনি আমার উপর রাগ করেছেন?

—না, না। তোমার উপর রাগ করবো কেন?

—আমি গাইতে বললাম বলেই এই লজ্জার ব্যাপারটা ঘটে গেল।

—না, না।

ফিসফিসিয়ে কথা বললো দু'জনে। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

—আমি এর প্রতিশোধ নেব, দেখবেন।

—না, তোমাকে কিছু করতে হবে না।

—আমি নেবোই। মাকে বলে আপনাকে একদিন নিমন্ত্রণ করছি। সারা দিনরাত আমাদের বাড়িতে থাকবেন। আমাদের বাড়িতে গ্রামোফোন আছে। অনেক রেকর্ডও আছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতও আছে। শোনাবো। তারপর আপনার গান শুনবো।

—না, না। তোমাকে এতসব করতে হবে না।

—আমাদের গ্রামটা ভীষণ কনসারভেটিভ। মানুষগুলো সব কেমন যেন। এতটুকু আধুনিকতা নেই।

জানলা দিয়ে স্নেহ দেখতে পেল বারান্দায় আলো বাড়ছে। স্নেহ বুঝল, জুলি আসছে আলো নিয়ে। নতুনমামীর দিকে ঝুঁকে পড়া ভঙ্গিটা সোজা করে নিল স্নেহ। জুলি জ্বালানো হ্যারিকেন নিয়ে ঘরে ঢুকল।

—এ্যাই তুই এবার চুপিচুপি চলে যা। বাবা ঠাকুরঘরে গেছেন। বৌদি, চল, গা ধুতে যাই।

স্নেহর উঠতে ইচ্ছে করছিল না। তবু উঠতে হল। এখন সে কোথায় যাবে। হঠাৎ আবার একটা শূন্যতার অনুভূতি তাকে ক্রমশ পেয়ে বসল। কদিন বেশ কেটেছিল লেখা-জোখা, ক্লাবের মিটিং নিয়ে। অর্ধেকের বেশী লেখা জোগাড় হয়ে গেছে। প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে আরো দু তিনদিন দেখা হয়েছে। একদিন চার-পাঁচ জনে মিলে তাঁর বাসায় গিয়ে ছবি এবং ডিজাইন আঁকার কাগজ রং-টং পেঁৗছে দিয়ে এসেছে। তাঁর আঁকা হয়ে গেলে সেই কাগজগুলো আবার পেঁৗছে দিতে হবে পিণ্টুকে। পিণ্টু তাদের

সহপাঠী। হাতের লেখা মুক্তোর মত। সে কথা দিয়েছে তাদের ম্যাগাজিনের সবকটা পাতা লিখে দেবে। অসুবিধের মধ্যে একটাই। পিন্টু থাকে স্নেহদের গ্রাম থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে।

সন্ধ্যের পর থেকেই গোটা গ্রামটা নির্জন। ঘরের আলো পথ থেকে দেখা যায় না। গেলেও অল্প। এই সময় মেয়েরা পুকুরে গা ধুতে আসে। ঘাটে ঘাটে আলো দেখা যায়। সেও জোনাকীর আলোর চেয়ে কিছু বেশী, আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত টাঙানো অন্ধকারের তুলনায়। অন্ধকার যেমনই হোক, স্নেহ তাতে অভ্যস্ত। স্নেহ সাইকেল চালিয়ে করুণাময়ের বাড়ির দিকে এগোয়। সে জানে, এই সময়টা খেলাধুলা শেষ করে নান্তু-শিবুরা করুণাময়ের পড়ার ঘরে বেশ কিছুক্ষণ আড্ডা জমায়। আজ করুণাময়ের লেখা দেবার কথা। কী লেখা দেবে কে জানে? করুণাময় স্নেহর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কবি হতে চায়। হয়তো কবিতাই দিয়ে বসবে। দিলে সে কবিতা স্নেহকেই কেটে-কুটে মেরামত করে নিতে হবে। কিন্তু সে-কথা তো বাইরের কেউ জানবে না। করুণাময় বাহাদুরী করে বেড়াবে। করুক।

সাইকেল চালাতে চালাতে হঠাৎ একটা জায়গায় এসে থেমে যায় স্নেহ। নেমে পড়ে সাইকেল থেকে। চুপ করে কান পেতে দাঁড়ায়। খুব অল্প দূরেই কান্নার শব্দ। সেই সঙ্গে অসংখ্য মানুষের কথাবার্তা, কোলাহল। স্নেহ আরো একটু এগিয়ে আসে। দেখতে পায় অন্ধকারে আলো হাতে কালো কালো মানুষের আসা-যাওয়া অধিকারীদের পুকুরপাড় দিয়ে। স্নেহ টের পায় একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে কোথাও।

—কে ওখানে?

স্নেহ চমকে ওঠে। তার পিছনেই কয়েকজন কালো মানুষ।

—আমি।

—ওঃ স্নেহবাবু ?

—কী হয়েছে ও পাড়ায় ? কামারপাড়ার দিকে ?

—আপনি জানেন না ? সে-তো বিকেলবেলায় হয়েছে। গলায় দড়ি দিয়ে মরে গেছে সুখী।

—সুখী ? সুখী মানে কালী মণ্ডলের বোন ?

—হ্যাঁগো।

এরা সব স্নেহর পাড়ার চাষী। মৃত্যু সংবাদটা দিয়ে যেদিকে দুর্ঘটনা সেদিকেই চলে যায় সবাই। আরো কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে থাকে স্নেহ।

সে যখন জুলির হাত ছুঁয়ে মনের উষ্ণ আবেগে রচনা করছিল রঙীন স্বপ্নলোক, তখনই নিজের হাতে নিজের গলায় দড়ি পরিয়েছে সুখী। সুখী নামটা সার্থক ছিল ওর জীবনে। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা নেই। একমাত্র ছেলে পরের বাড়ির এঁটোকাঁটা খেয়ে মানুষ। সুখীর সঙ্গে বেপাড়ার একজন পুরুষের সম্পর্ক ছিল, সবাই জানতো। দুঃখে, দারিদ্র্যে, লাঞ্ছনায় ভরা জীবন। তবু সুখীর মুখে হাসি কোনদিন নেভেনি। স্নেহর দাদুর শ্রাদ্ধের সময়ে সারারাত হ্যাজাকের আলোয় গ্রামের যে-সব চাষী মেয়ে-বৌরা আনাজ কুটেছে, বাটনা বেটেছে, সুখীও ছিল তাদের মধ্যে। সুখী কারো বাড়ির ঝি ছিল না। এক সঙ্গে দশ বাড়ির দশ রকমের কাজ করে যা পাবার পেতো। সারারাত সুখী সেদিন শুধু কাজই করেনি। কাজের একঘেয়েমী অবসাদকে কাটিয়ে দিতে হাসি-ঠাট্টা গল্পে-গুজবে মশগুল করে রেখেছিল সবাইকে।

শরীরে মনে সুখী একটা প্রাণবন্ত মেয়ে। কী এমন দুঃসহ দুঃখ তার গলায় ফাঁস এঁটে দিলে, কে জানে। মানুষের মুখ দেখে তার ভিতর তো বোঝা যায় না। অন্তস্তলের আনন্দ কিংবা বেদনাকে গোপন করার মুখোশটাই যেন মানুষের মুখ। বিভা-কাকীমারও মুখের আড়ালে বুকের বেদনা লুকনো।

স্নেহ আর সাইকেলে চাপল না। ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে চলল করুণাময়দের বাড়ির দিকে। অবশ হয়ে গেছে তার সমস্ত উদ্দীপনা। স্নেহর মনে হয় তার কিশোরীদাদুর চেয়ে আরও বিরাট আরও নিষ্ঠুর একটা লোক এই পৃথিবীর ভিতরে আকাশে-বাতাসে লুকিয়ে আছে কোথাও। তার কাজই হল সব কিছুকে পূর্ণ হবার আগে থামিয়ে দেওয়া।

৬

সকালবেলায় নিজের পড়ার ঘরে এসে বাঁ-হাতে মুড়ি খেতে খেতে ডান হাতে বীজগণিতের অংক কষছিল স্নেহ। কানে এল বাইরের দরজায় কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। স্নেহ উঠে পড়ল। নান্তু, শিবু, তারক, ঘনা আর করুণাময় দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। স্নেহ কাছে না-গিয়ে দূর থেকে ডাকল—

—আয়, ভিতরে আয়।

উঠোন পেরিয়ে ওরা স্নেহর পড়ার ঘরে ঢুকল। তারকের হাতে গোল করে পাকানো, লাল সুতোয় বাঁধা একটা বাণ্ডিল।

—প্রফুল্লবাবুর ওখান থেকে?

—হ্যাঁ। দেখ মাইরী, কী কাণ্ডটা করে দিয়েছে।

তারক ছটফট করে কাগজের বাণ্ডিলটা খোলে। পাকানো কাগজগুলো সোজা হয়ে ছড়িয়ে যায়। স্নেহ অবাক হয়ে একের পর এক পাতা উল্টে দেখে যায় সাদা কাগজের চারপাশের কোণে কোণে আঁকা নানা রঙের বিচিত্র নক্শাগুলো। কোনটা ফুল। কোনটা পাখি। কোনটায় প্রজাপতি। কোনটাতে শুধু লতা-পাতার প্যাটার্ন। হরিণ ছুটছে বনের ডালপাতায় মিশে। মেঘ আর সূর্য। আকাশ আর নক্ষত্র। জল এবং ফুল। তরঙ্গ এবং নৌকা কোথাও এতটুকু দাগ পড়েনি, ময়লা লাগেনি। দেখে মনে

হয় না হাতে আঁকা। ছাপার মত হুবহু। স্নেহর নিজের অস্থির আবেগকে থামিয়ে রাখতে পারে না।

—মা, ওমা, মা-আ-আ।

অনেক দূর থেকে মায়ের সাড়া আসে।

—একবার দেখে যাও না এসে।

—কী, কী দেখবো? দাঁড়া বাপু, এখুনি সব এসে পড়বে, আমার এখনো উনোনই ধরানো হয়নি। তোকে যে বললাম অর্জুনকে ডেকে আন। নেমন্তন্ন তো করে এলি। মাছ-টাছ না-ধরলে খাবে কি দিয়ে?

—রুনুকে পাঠিয়েছি ডাকতে। তুমি একবার এস না। এক মিনিটের জন্যে।

মা-এর আসতে দেরী হয়। তার আগেই ছুটে আসে সীতু। দাদার ঘরের মধ্যে পাড়ার এতগুলো ছেলেকে একসঙ্গে দেখে কিছুটা ঘাবড়ে যায় সে। ঘরে ঢোকে না। বাইরে থেকে বলে—

—কী জিনিস, দেখতে দেনা একবার।

—তুই বুঝবি না।

স্নেহ সীতুকে রাগাবার জন্যেই বলে কথাটা।

—আহা! তুই একবারে সব বুঝিস! নান্তুমামা, দেখছেন, দিচ্ছে না।

—ভেতরে এসে দেখে যা। অত লজ্জা কীসের?

সীতু লজ্জা কাটিয়ে স্নেহর পাশে এসে বসে পড়ে।

—দ্যাখ। আমাদের ম্যাগাজিন হবে এই সব পাতা দিয়ে। বুঝলি?

—এখুনি নিয়ে চলে যাবে?

—হ্যাঁ। কেন?

—একদিন রাখ না দাদা। দেখে দেখে একটু তুলে নেবো।

—ইয়ার্কি আর কি। আমাদের ডিজাইন মেরে উনি টেবিল ক্লথ বানাবেন।

করুণাময়ের মনে হঠাৎ কী কারণে করুণা জাগে।

—বলছে যখন রেখে দেনা একটা দিন।

—আরে না, তুই জানিস না ওদের। কালি-ঝুলি মাখিয়ে একসা করে ফেলবে।

এই সময় মা এসে দাঁড়ান। পিছনে অনুপিসী। মা-ও খুব প্রশংসা করেন। সব দেখে শুনে মা সীতুর পক্ষ নিয়ে বলে—

—তোকে তো কতবার বলেছে বাপু, সেই তোরা দিনরাত যাচ্ছিস, ওর কাপড়ে একটু আঁকিয়ে এনে দিলে তো পারতিস।

—আহা! ভদ্রলোকের সঙ্গে কত অল্প আলাপ। ম্যাগাজিনের ব্যাপার, একটা বড় ব্যাপার। তার মধ্যে নিজের বোনের জামা-কাপড়ের কথা বলা যায় নাকি? আমার দ্বারা ওসব হবে না।

—দ্যাখ না, মা, একটা দিন মাত্র রাখতে বলছি, তাও রাখছে না।

—না মা, রাখা যাবে না। আমাদের স্কুল খুলতে আর মাত্র সতেরো দিন বাকী। এর মধ্যে পিন্টুকে এতগুলো পাতা লিখতে হবে।

—কী জানি বাবা, তোমরাই বোঝ তোমাদের ব্যাপার।

মা চলে যান। পিছনে অনুপিসী। সীতুও ঝটকা বেগে উঠে যায় চোখের কোণে অভিমানের জল নিয়ে। স্নেহ বলে—

—কে যাবি, পিন্টুকে পেঁাছে দিতে?

—কেন, তুই যাবি না?

—আমি? আজ হলে আমি পারব না। আজ আমাদের বাড়িতে জুলিমাসীদের নেমন্তন্ন আছে।

নান্তু গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করে—

—আমাকে বললি না যে।

—তোকে বলব কেন? তুই তো ছেলে। শুধু মেয়েদের নেমতন্ন।

শিবু যেন কী একটা মন্তব্য করল অস্ফুটভাবে। সেটা শুনে হেসে উঠল করুণাময় আর তারক। স্নেহর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে সন্দেহে। নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে ঠাট্টা।

—হাসলি কেন রে?

—সে একটা কথায়।

—কী কথা?

—না, মানে শিবু বলছিল যে, তোর একটু মেয়ে নেকড়া স্বভাব আছে।

স্নেহর চোখ নাক মুখ কান লাল হয়ে ওঠে নিমেষে।

—আছেই তো। শুধু আছে নয়, থাকবেও। খানিকটা 'আউট নলেজ' থাকলে বুঝতিস, কেন থাকে। যারা লেখে বা 'ক্রিয়েট' করে কিছু, তাদের সকলেরই থাকে।

—যাক ভাই, আমার উপর রাগ করিসনি। আমি তো আর বলিনি।

—খুব হয়েছে। তুমি হচ্ছ শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।

—যাক্ গে, চুপ করে যা। এখন আসল কথা তুমি হচ্ছ সম্পাদক। তুমি যদি নিজে গিয়ে যে লিখবে তাকে বুঝিয়ে দিয়ে না আস, তাহলে সে তো উল্টোপাল্টা লিখে বসবে। তোমার নিজেরই যাওয়ার দরকার, যাই বলো।

—কই গো, মা কোথায়?

উঠোন থেকে এই সময় ভেসে এল অর্জুনের ভাঙাচোরা বুড়োটে গলার আওয়াজ। মা-ও ঠিক শুনতে পেয়েছেন।

—কে? অর্জুন? দাঁড়া বাবা, যাচ্ছি।

স্নেহকে চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখে নান্তু বলে—

—আমরা তাহলে উঠি? এসব রইলো।

স্নেহর কপালে ভুরুতে রাগের বাঁকা রেখা।

—ঠিক আছে, যাও।

সবাই চলে গেলে স্নেহ নিজের মনে ভাবতে লাগল, ওদের ঠাট্টা-ইয়ার্কি গায়ে মাখলে চলবে না। আমি যে ওদের চেয়ে আলাদা, সেটাতেই ওদের রাগ। সাধারণ মানুষের স্বভাবই এই। তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি বা হিসেব-নিকেশের সীমা ছাড়িয়ে কেউ যদি লম্বা হয়ে ওঠে, তাহলে তাদের দুটো কাজ। হয় গায়ে কাদা ছিটিয়ে ছোটো করা, নয় ফুল দিয়ে পুজো করে দেবতা বানানো। ঐ ফচ্‌কে শিবুকে এবার শিক্ষা দিচ্ছি। পাঁচ পাতার একটা লেখা দিয়েছে। না প্রবন্ধ, না গল্প। বিষয় কি? না, সাঁকোর কথা। রবীন্দ্রনাথের ঘাটের কথা গল্পটা পড়ে, তারই অনুকরণে আবোল-তাবোল। কেটেছেঁটে ওটার কী চেহারা করি দেখবে এবার।

মনের ক্ষোভে স্নেহ অনড় হয়ে বসে থাকে। হাতের সামনে চৌকির ওপর ছড়ানো বইপত্তর, আর প্রফুল্লবাবুর এঁকে দেওয়া কাগজ। গোছাতে গিয়েও হাত ওঠে না। জুলিমাসি আর নতুনমামী এখনো আসছে না কেন? বলেছিল স্নান করেই আসবে। কটা বাজে এখন?

—সীতু-উ।···পিসী···

কোনখান থেকে সাড়া আসে না। হঠাৎ দোতলার থেকে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে একটা দুদ্দাড় শব্দ ভেসে আসে। স্নেহ দরজা দিয়ে উঁকি দেয়। সীতু নামল ঐভাবে দোতলা থেকে। সীতু যখন উঠোন দিয়ে চলেছে, স্নেহ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে—

—এ্যাই, ছুটছিস কেন রে? কী হয়েছে? অর্জুনকাকার জালে মাছ পড়েছে বুঝি?

জোরে হাঁটতে হাঁটতেই উত্তর দেয় সীতু—

জুলিমাসিরা আসছে।

স্নেহর অনড় অবশ ভঙ্গির মধ্যে মুহূর্তে একটা শিহরণ।

এখন কী করবে সে ? ছুটে যাবে বাইরে ? না এইখানেই বসে থাকবে ? কিছু পড়বে ? না লিখবে ? বীজগণিতের অঙ্ক এখন সে কষতে পারবে না, এটা বুঝেও স্নেহ বীজগণিতটাই টেনে নিল। তার আগে ঘরের দরজটা ভেজিয়ে দিল পায়ের ঠেলায়।

বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে শব্দ আসে। সীতুর গলা। জুলিমাসির হাসি। শিউলীমামীর সোনার চুড়ির শব্দ। মায়ের কথা। মা বললেন সীতুকে

—যা, দোতলার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা গে।

স্নেহ প্রত্যাশায় অধীর। দোতলায় ওঠার মুখেই স্নেহর পড়ার ঘর। জুলিমাসি জানে। নিশ্চয় ওরা ওপরে ওঠার আগে এই ঘরে একবার ঢুকবে। দোতলায় ওঠার মুখে সীতু অন্তত বলবে —এই যে মামী, এইটা দাদার পড়ার ঘর। ওরা কথা বলতে বলতে দোতলায় উঠে গেল। স্নেহ দরজার দিকে তাকিয়েছিল। হতাশা যেন তার গালে একটা চড় মেরে মুখটাকে আবার নামিয়ে দিলে বীজগণিতের দিকে।

কী অকৃতজ্ঞ এরা ! আমার জন্যেই নিমন্ত্রণ। আমিই মাকে রাজী করিয়েছি। জুলিমাসি অন্তত সেটা জানে। মায়ের নাম করে না-বললে, কিশোরীদাদু ঘরের বাইরে এক পা বেরুতে দিত ? অথচ আমারই খোঁজ নেওয়ার কথাটা মনে পড়ছে না কারো ?

স্নেহ প্রফুল্লবাবুর এঁকে দেওয়া কাগজগুলোকে সযত্নে বাঁধতে থাকে। দেওয়ালের তাক থেকে নামায় ম্যাগাজিনের বাছাই করা লেখাগুলো। খুব বড় একটা খবরের কাগজে দড়ি দিয়ে বেঁধে একটা বাণ্ডিল করে নেয়। বই-খাতা তুলে রেখে স্নেহ বেরিয়ে আসে বাইরে। ধানের মাচার গায়ে হেলান দিয়ে-রাখা সাইকেলটা টেনে নেয় নিঃশব্দে।

এর অনেক পরে স্নেহর মা তিনটে কাঁচের প্লেটে যত্ন করে সুজির হালুয়া সাজিয়ে সীতুকে বললেন

—এই দুটো প্লেট ওদের দিবি। আর এটা সেনুকে দে। তোদের তিনজনের জন্যে এখানে রইল নিয়ে নিস।

সীতু দাদার পড়ার ঘরের দরজা ঠেলে চেঁচিয়ে মাকে জানালে

—ও মা, দাদা তো কখন বেরিয়ে গেছে।

—তাহলে এখানে দিয়ে যা। চাপা দিয়ে রাখি। যখন ফিরবে, খাবে।

সুজির হালুয়া খেতে খেতে শিউলীমামী বললে

—আমরা এসেছি, স্নেহ বুঝি খবর পায়নি এখনো? পেলে তো ছুটে আসতো।

হালুয়া চিবোতে চিবোতে ভরা গলায় জুলি বললে

—ও কি ঘরে বসে থাকার ছেলে নাকি? আর পারেও বটে রোদে ঘুরতে।

৭

—তোমার শরীরে বড্ড রাগ, তাই না?

—আর আপনাদের শরীরে বুঝি বড্ড দয়া? দেখুন, আমি রাগ ভুলতে আপনার কাছে এসেছি। আমাকে বকবেন না একদম।

—সে তো তোমার চেহারা দেখেই বুঝেছি। কার উপর রাগ? কে?

—বলব না। আপনি উঠুন তো। আপনি উৎসাহ দিয়েছেন, চাঁদা দিয়েছেন। আপনার নাম থাকবে পৃষ্ঠপোষক-মণ্ডলীর মধ্যে। তাই আঁকা কাগজগুলো আপনাকে দেখাতে এনেছি। এমনি আসিনি।

—কোথায়, এত যাবার তাড়া কোথায়?

—যে-ছেলেটি লিখবে তাকে সব কাগজপত্র পেঁছে দিতে যাব। সে অনেক দূরে থাকে।

—সব লেখা পেয়ে গেছো ?

—প্রায়। আপনি উঠুন না। আপনাকে একটা জিনিস দেখাবো।

—কি ?

—লেখক নরেন গাঙ্গুলীর নাম তো শুনেছেন ?

—কেন শুনব না। কত বই পড়েছি। নামকরা লেখক।

—তিনি আমাকে একটা চিঠি লিখেছেন। সবুজ কালিতে কী চমৎকার হাতের লেখা। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে উনি উত্তর দেবেন।

সাঁতলানো আনাজে জল ঢেলে, কড়ার উপর থালা চাপা দিয়ে বালতীর জলে হাত ধুয়ে, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়াল বিভা।

—এসো।

বিভার পিছন পিছন রান্নাঘর ছেড়ে ঢাকা বারান্দার দিকে এগিয়ে চলল স্নেহ। বিভা গেল তার শোবার ঘরে। স্নেহ বসল বাইরে চৌকির উপর। আবার সেই পাকা বেলের সুবাস, স্নেহরঃঘ্রাণে যা বিষাদের গন্ধ।

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠল স্নেহ। গোটা বাড়িটায় সবকটা দরজা-জানলা একসঙ্গে আছাড় খেল তীব্র শব্দে। বারান্দার দেয়ালে টাঙানো কাঁচের ছবিগুলো কেঁপে উঠল ঝনঝনিয়ে। হালকা জিনিসপত্রগুলো পাক খেয়ে উড়ে যেতে লাগল। স্নেহর কাগজের বাণ্ডিলটা চৌকি থেকে গড়িয়ে পড়ল নিচে। স্নেহ কোনটা ধরবে, কোনটা কুড়োবে বুঝেতে পারে না।

—ও স্নেহ, স্নেহ…

—দারুণ ঝড় উঠেছে কাকীমা—

—স্নেহ একবার এঘরে দৌড়ে এসো। কী বিপদে পড়েছি

আমি। সব উড়ে যাচ্ছে যে। জানলাগুলো একা কী করে—ইস্, ধুলোয় ঘরটা ভরে গেল একেবারে।

স্নেহ নিজের বাণ্ডিলটা হাতে নিয়ে ছুটে যায় বিভার ঘরে।

—আগে জানলাগুলো বন্ধ করো স্নেহ।

স্নেহ জানলা বন্ধ করতে থাকে। তারই মধ্যে একটা কাপড়ের আনলা উপুড় হয়ে পড়ে যায়। শুকনো পাতার ঘূর্ণির মত ঘরের মধ্যে পাক খেতে থাকে একরাশ কাগজ।

—এতো কাগজ কোত্থেকে উড়ছে?

—ডানদিকের, স্নেহ ডানদিকেরটা আগে বন্ধ কর। কী কান্ড! ছিঃ ছিঃ ও স্নেহ কত কাগজ যে উড়ে গেল বাইরে। তুমি আগে ওগুলো কুড়িয়ে নিয়ে এস। আমি না-হয় জানলা ভেজাচ্ছি।

—আপনি দরজাটা খুলে রেখেছেন কেন? আরও তো সব উড়ে যাবে।

—বারান্দায় অনেকগুলো কাগজ উড়ে গেছে। তুমি আগে কুড়িয়ে নিয়ে এসো।

স্নেহ বারান্দায় এসে প্রত্যেকটা উড়ো কাগজের পিছু পিছু দৌড়তে থাকে। অনেক চেষ্টার পর সব কাগজ কুড়োতে পারে সে। তখন অন্য রাশিকৃত ছড়ানো-গড়ানো জিনিসে আর শুকনো পাতার গুঁড়োয় বারান্দাটার একটা ছন্নছাড়া চেহারা। স্নেহ বাইরের দিকে তাকায়। হিংস্র বাতাস চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে চলেছে গাছে গাছে। হঠাৎ একটু আলতো কৌতূহলে স্নেহ হাতের কাগজগুলোর দিকে তাকায়। তাকিয়েই বুঝতে পারে, কাগজগুলো চিঠি। বিভাকাকীমাকে লেখা।

প্রিয়তমাসু—

বিভা,

তোমার চিঠির অক্ষরগুলো আমার রুক্ষ জীবনে শ্রাবণের বৃষ্টির মত স্নিগ্ধতা বয়ে নিয়ে এলো।···

কে লিখেছে? কাকা? স্নেহ চিঠিটা উল্টে নিল দ্রুত। না। ইতি কিঙ্কর। কিঙ্কর? কিঙ্কর কে? আরো একটা চিঠির উপর চোখ পাতল স্নেহ।

প্রিয় বিভা,

অফিস থেকে বাড়ি ফিরেই তোমার চিঠিখানাকে কে যেন আমার বিছানায় শুইয়ে রেখে গেছে। অনেকক্ষণ চিঠিটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ছুঁইনি। তোমার চিঠি থেকে তুমি হঠাৎ জীয়ন্ত হয়ে জেগে ওঠো কিনা, সেইটে দেখার···

কে লিখেছে? হ্যাঁ, সেই কিঙ্করই। দ্রুত অন্য একটা চিঠিকে চোখের সামনে আনল স্নেহ।

বিভা আমার,

তোমার আগের চিঠিটা অমন অশ্রু দিয়ে ভেজানো কেন? আমরা দুজনেই তো জানি আমাদের এই বিরহের অন্তরালে কোনদিন আর সেতু বাঁধা···

—স্নেহ, স্নেহ—

স্নেহ আর পড়তে চেষ্টা করে না। এগিয়ে যায় বিভাকাকীমার ঘরে। বিভা কাগজগুলো ছিনিয়ে নেয় স্নেহর হাত থেকে।

—এতোগুলো কাগজ বাইরে উড়ে গেছল? আর নেই তো?

—না।

—তুমি পড়েছো নাকি?

—কী পড়বো?

—না, পড়বে না। স্নেহ, চুপ করে বোসো। আমি একটু গুছিয়েনি। তোমার জন্যেই এই কাণ্ড।

—আমার জন্যে? কেন, আমি কী করলাম? ঝড়কে আমি ডেকে এনেছি নাকি?

—তোমার জন্যে কবিতার খাতাটা খুঁজতে গিয়েই তো ট্রাঙ্কটা খুলতে হল।

—আমি তো আজ আপনাকে কবিতা চাইনি।

—খুব হয়েছে। আর কথা বলতে হবে না।

আবছা অন্ধকারের মধ্যে বিভার নড়াচড়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে স্নেহ। অন্ধকার মানুষের অনেকটা ব্যক্তিত্ব কেড়ে নেয়। অন্ধকারে মুখের অনেক রেখা, চোখের অনেকটা চাউনি চোখে পড়ে না। তার চেয়ে বয়সে দুগুণ বড় বিভাকে অন্ধকারে অনেকটা ছোট, অনেকটা সহজ, মনে হচ্ছিল স্নেহর। বন্ধ জানালায় তখনো অবিরত ধাক্কা মেরে চলেছে গোঁয়ার বাতাস। ঝড় থামেনি। কান পাতলেই শোনা যায়, বাইরে কত কী জিনিস ভাঙছে, পড়ছে, ঝরছে, খসছে, কত রকমের বেসুরা শব্দের গোঙানি তুলে। স্নেহর ইচ্ছে করল, ইচ্ছে করার সঙ্গে সঙ্গে সাহসও অনুভব করল মনে মনে, সেও একটা কিছু ভাঙে।

—কিঙ্কর কে?

—কিঙ্কর? কে কিঙ্কর?

—ঐ যে চিঠিতে লেখা।

—তুমি বুঝি পড়েছো তাহলে!

—না পড়িনি। নামটা চোখে পড়ে গেছে।

ট্রাঙ্কের ডালাটা বন্ধ করে বিভা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ কোন কথা বলে না। তারপর স্নেহর পাশে এসে বসে।

—কত লোককে এটা বলে বেড়াবে?

—কাউকে না। আমি তো জানতাম।

—কী জানতে?

—আপনার কোথাও একটা ভীষণ দুঃখের জায়গা আছে।

স্নেহর মাথার ঝাঁকড়া কালো চুলে বিভার সাদা হাতের কোমল আঙুল।

—ও মারা গেছে। আমাকে ভালবাসতো। অসুখের সময় ও যা করেছে, আমার মা-বাবাও করেনি।

আমিও তোমাকে ভালবাসি বিভা কাকীমা, এই কথাটা মুখে বলতে পারবে না জেনেই স্নেহ বিভার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। তার মনে হয়, যেন ঝড়ে উড়ে চলেছে কোথাও।

রচনার শেষে পূর্ণচ্ছেদের দাঁড়িটা পড়তেই স্মরণের কুঁজো শরীরটা সোজা। কলমটা বিছানায় নামিয়ে রেখে, হাত দুটো নিয়ে যায় পিঠে। দশ আঙুলের জটে হাত দুটো বেঁধে, হাতের কনুই দুটোকে শূন্যে উঁচিয়ে, ঘাড় তুলে, পিঠটা পিছনে বাঁকিয়ে শরীরের আড় ভাঙে। আর তখনই তার মুখ থেকে মর্মান্তিক আর্তনাদতুল্য একটা ধ্বনি,

আঃ-আ-আ-আ-আ।

অথচ তা আর্তনাদ নয়। কেননা তার কপালে উজ্জ্বলতা, চোখে পরিতৃপ্তি এবং পাণ্ডুলিপির উপরে রোদের ডোরা। অনেক দিনের আবদ্ধ দরজা খোলার সময়ও আমরা শুনে থাকি এই জাতীয় আর্তনাদ। মুক্তির মুহূর্তে এই ধ্বনি হয়তো বা যন্ত্রণার অবশিষ্ট তলানির শেষ উদ্গার।

আড় ভাঙার পর সে আঙুল মটকায়। ডান হাতের পাঁচটা আঙুলেই পাঁচবার খট্। কিন্তু বাঁ হাতে মাত্র তিনবার। সেটাই স্বাভাবিক। কেননা গত তিন দিন ডান হাতের আঙুলই একটানা পরিশ্রমী। এই মুহূর্তে, অর্থাৎ শেষ কবিতায় পূর্ণচ্ছেদের পর যারা নেতিয়ে পড়ার মতো ক্লান্ত। ডান হাতের আঙুল পাঁচটার সম্পর্কে স্মরণ সহানুভূতিশীল। তাই বাঁ হাতের পাঁচটা আঙুলে সে ডান হাতের পাঁচটা আঙুলকে আঁটি বাঁধার ভঙ্গিতে জড়ো করে। ঘুরিয়ে, পাকিয়ে, মুচড়িয়ে চাপ দেয় ক্রমশ। আঙুল পাঁচটায় অফুটন্ত পদ্মের আকৃতি। পদ্মের সাদৃশ্যকে সম্পূর্ণ করার দায়িত্বতেই আঙুলের পাঁচটা ডগা রক্তবর্ণ। হাতের সেবা-শুশ্রূষার পর সে আবার হাত দুটোকে নিয়ে যায় পিছনে। পুরনো পটে

যেভাবে থাকে, চৈতন্যদেবের শিষ্যদের নৃত্যরত ভঙ্গির সেই আদলে, হাত দুটো শূন্যে রেখেই সে ডন-বৈঠক করিয়ে নেয় বেশ কয়েকবার।

—শীলা-আ-আ-আ-আ।

যদিও তার শরীরে অবসাদ, কিন্তু ডাকটার মধ্যে দাপট। অনুরোধ বা আহ্বান নয়, আদেশ। শরীরের প্রসঙ্গ না ভাবলে, স্মরণ এখন, তার চেতনার পরিস্থিতির বিচারে, বেশ তরতাজা। গর্বিত হওয়ায় অজস্র ডালপালা এখন তার ভিতরে। মাথায় পরার একটা অদৃশ্য মুকুটও পেয়ে গেছে যেন। এই কর্তৃত্ব, কণ্ঠস্বরের, উপহার হিসেবে পাওয়া নয়। পরিশ্রমের বিনিময়ে এবং সৃষ্টির উল্লাসে অর্জন করা। শুধু শীলা কেন, পৃথিবীর আকাশ-মেঘের দিকেও সে এখন ভাসিয়ে দিতে পারে হুকুম। পৃথিবীর সব কিছুই এখন তার বশ্যতার অন্তর্গত। কারণ গত কয়েকদিনের উপর্যুপরি সংগ্রামে সে জয়ী। সামনে ছড়ানো পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো তার দিগ্বিজয়ের দলিল।

পরবর্তী কাজগুলোকে মনে মনে গোছাতে থাকে সে।

আগে দরকার এক কাপ গরম চা। চা এবং সিগারেটের পর আরেক বার চোখ বুলিয়ে নেবে কবিতাগুলোর ওপর। আবেগ-ব্যস্ততায় কিছু ভুল ঘটে যায় অনেক সময়ই। আর শব্দেই যেহেতু অমরতা, দেখে নিতে হবে কোনো শব্দ বাতিল হওয়ার যোগ্য কিনা অথবা তাকে সরিয়ে ভিন্ন শব্দ। অবশ্য খুব বেশি পরিবর্তন বা ঘষা-মাজার প্রয়োজন নেই। কারণ স্মরণের পছন্দ নয় ওটা। ব্যবহৃত কাপড়ের মতো কবিতায় কিছু এলোমেলো ভাঁজ থাকা ভালো। এটা তার বিশ্বাস। তার পর লেখাগুলোকে বেছে নিতে হবে বিভিন্ন পত্রিকার চরিত্র অথবা পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী। তবে নিজেদের কাগজ 'সংঘর্ষ'-র জন্যে যে কবিতাগুচ্ছ, সেসব লেখা আগে থেকেই বাছাই। সেইগুলোই তার আসল লেখা। তার

স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচার, বিস্ফোরণ সব সেইখানেই। তার দৃপ্ত এক্সপেরিমেণ্টও বটে। বাস্তবতা, কমিটমেন্ট, সময়চেতনা, সব কিছুতেই রাজনীতি, প্রগতিশীলতার ধুয়ো, এ-সবের মুখে লাথি অথবা থুতুর মতো এই কবিতাগুচ্ছ। এতে শুধু শরীর। জঙ্ঘা স্তন, রোম, ঊরু, ভুরু, ঘাগরা, কোমর, সায়ার দড়ি, ঘোড়ার নাল, হ্রেষা, নীল মুঠো, যোনি, ওষ্ঠাধর, নৌকা নিমজ্জমান, তোড়, জলরাশি, বেডশিটে বাসি ফেনা, ঝিনুক, ঝিনুকের খোসা খুলে ডুবুরি, প্লেটভর্তি লাল মাংস, মল্লিকার কুঁড়ি ভেদ করে পাইপ-গানের নল, জীপ, জঙ্গল, বৃষ্টির বলাৎকারে শুদ্ধ অরণ্য, অবৈধ প্রণয়ের ষড়যন্ত্রে মাটিতে ঝুঁকে পড়া মেঘ···অর্থাৎ সব মিলিয়েই, ঐ, যা আগে বলা, তার স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচার, বিস্ফোরণ, গভীর অর্থে, কবিতাকে বামুন-কায়েতের কৌলীন্য থেকে, শুচিবাই, যে-কোনো প্রকার শাসন, চোখরাঙানি থেকে বন্দী-মুক্তির আলোয় ছড়ানো। এবারের এই কবিতাগুচ্ছ ছেপে বেরোলে, সব প্রথম কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে

'আমি কবিতার পকেটে পুরে দিয়েছি বেশ্যাবাড়ির ঠিকানা'

নির্ঘাত তুমুল চেঁচামিচি, যা সে চায়, সুনিশ্চিত করবে তার আধিপত্য। অর্থাৎ সিংহাসনের সিঁড়ির দিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া।

—মাকে এত ডাকছ কেন?

স্মরণের কাছে এসে দাঁড়ায় তার পাঁচ বছরের মেয়ে রুচি।

—এত কই? ডেকেছি তো একবারই।

—বাঃ রে, কতবার ডাকলে।

—তাই নাকি?

—নিজে ডেকে নিজেরই মনে নেই? বেশ তো তুমি।

—তা হবে। মা কোথায়?

—মা টুলু মাসীর সঙ্গে কথা বলছে।

—টুলু মাসী কখন এল ?

—এই তো একটু আগে। তুমি বিছানায় বসে আছ বলে মা রান্নাঘরের বারান্দায় বসে কথা বলছে।

—কি কথা ?

—সে আমি জানি নাকি ? ব্লাউজ নিয়ে কথা বলছে।

'ব্লাউজেরও গায়ে রমণীর আঁশ লেগে'

একি ? কবিতার একটা আস্ত পংক্তি, ব্লাউজ শোনা মাত্রই ? নিজের মনের দিকে বিস্মিত তাকায় স্মরণ। নিজেকে আদর করার মতো প্রীতিভাজন মনে হয়।

কবিতার ঘোরে আছি। এখন তা হলে যে-কোনো শব্দ, বাক্য, দৃশ্য, উচ্চারণই আমাকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নেবে নাকি ? এখুনি কি বসে যাব এই হঠাৎ-পাওয়া পংক্তিটাকে নিয়ে নতুন লেখায় ? নাকি লেখা-কবিতার মধ্যে গুঁজে দেব কোথাও ? যদি হারিয়ে যায়, পংক্তিটা কি টুকে রাখব ? রাখা উচিত নয় কি ? একবার ভুলে যাওয়ার পর যদি আর মনে না পড়ে ?

—কিছু বলচ না কেন ?

—কি বলব ?

—মাকে কি বলব ? তুমি অমন বোকার মতো তাকিয়ে থাক কেন গো ?

—কোথায় তাকিয়ে থাকি ?

—আমি কি করে বলব ? তোমাকে বেশ বোকা-বোকা লাগে।

—মাকে শুধু বলো, আমি ডাকছি।

রুচি চলে গেলে স্মরণ শুয়ে পড়ে, পিঠের ব্যথাটা একটু আরাম চাইছে অনেকক্ষণ। কটা বাজে এখন ? ঘড়িটা শীলার ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে। নামলেই পাওয়া যায়। কিন্তু স্মরণের নামতে ইচ্ছা করে না। বিছানায় শুয়ে সে কবিতার স্তবকগুলোকে

মনে মনে উচ্চারণ করার চেষ্টা করে। এলোমেলো মনে পড়ে, ধারাবাহিক নয়। যেটুকু মনে পড়ে তাতেই পরিষ্কার বুঝতে পারে আজ কফি হাউস উথলে উঠবে তাকে নিয়ে।

অবশ্য নিন্দুকেরও অভাব নেই। তারা শান দিয়ে রেখেছে ঠোঁটে। যা বহুদিন আগে পচে গেছে, কবর খুঁড়ে তাকে জাগানোর মধ্যে যে প্রবণতাটা, সেটা ক্রিমি-কীটদেরই সহজাত। মূর্খ নই, সুতরাং ইঙ্গিতটা বুঝি। কিন্তু আমি তো দুগ্ধপোষ্য সুবোধ বালক হওয়ার জন্যে জন্মাই নি। মানুষ হিসেবে যেহেতু আমি কৃতজ্ঞ, সুতরাং ঋণশোধটাও আমার কর্তব্যের এলাকায়। যা কিছু আমার চেতনাকে পুষ্ট করেছে দুধ-ক্ষীরে, তাদের সকলের গলাতেই পরিয়ে যাব আন্তরিক অভিনন্দনের মণিহার, আমারই রক্তজাত শব্দে গাঁথা।

শরীর, একটি নারীর শরীর, অন্যের কাছে শুধু শরীর মাত্র। আমার কাছে দুর্লভ এক চশমা। এই চশমার ভিতর দিয়ে না দেখলে পৃথিবীর বসুন্ধরা-মূর্তি নজরের আড়ালেই রয়ে যাবে চিরদিন। বোদলেয়ার মূর্ত করেছিলেন নরকের ফুল। আমি গড়তে চাই ফুলই নয় শুধু, ফুলসহ এক প্লাবিত শস্যক্ষেত্র। অর্থাৎ বোদলেয়ারের পুনরুজ্জীবন নয়, বোদলেয়ারের বৃত্তের একস্‌টেনশন।

—ডাকছিলে কেন? কি ডাকাডাকি বাবা! তাড়াতাড়ি বলো। টুলু বসে আছে।

স্মরণ তার শায়িত ভঙ্গিটাকে না-ভেঙেই মুখটাকে ঘোরায় শুধু শীলার দিকে। শীলার মুখে রান্নাঘরের তাপ ও ঘাম।

—টুলু কেন?

—কেন আবার! আমি ডেকেছিলাম আমার দরকারে।

—আমার লেখা হয়ে গেছে। তোমরা এ ঘরে আসতে পারো।'

—আর কি হবে! যা দরকার ছিল মিটে গেছে। কেন ডাকছিলে বলবে তো!

স্মরণ চায়ের কথাটা তুলতে সাহস পায় না। মুখে উনোনের আগুনের শিখা লেগে আছে যেন শীলার। চায়ের প্রস্তাব শুনলে মুখের আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে বচনেও। একবার রেগে উঠলে শীলা লং প্লেইং-এর মতো অনেকক্ষণ

কবিতার নারী আর বাস্তবের নারীতে কত ফারাক। বস্তুত কবিতা বা শিল্পই নারীকে দিয়েছে এক ধরনের চিররূপ। সেখানে তারা বয়স্ক, বাচাল অথবা অতিরিক্ত বিবেচনায় হেডমিস্ট্রেস মার্কা হয় না কখনো। আমার কবিতায় এত নগ্নতা, রমণী-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এত স্তর, কিন্তু সে কোন্ রমণীর? আমি নিজেও কি তাকে দেখেছি কখনো? ভাগ্যিস দেখি নি। বিয়াত্রিচের সঙ্গে বিবাহিত জীবন কাটালে দান্তের মহাকাব্য···

—কি হলো, মুখের দিকে অমন হাঁ-করে তাকিয়ে আছ কেন? কেন ডাকছিলে বলবে তো!

—গোটা তিনেক আলপিন বা পেপার-ক্লিপ যা হোক দেবে?

—সত্যি, লোক বটে! তিনটে আলপিনের জন্যে তখন থেকে এত হাঁকডাক? আমি এখন আলপিন পাব কোথায়? আমি আলপিন নিয়ে কি করি যে আলপিন পাব?

—ক-দিন আগে তোমার ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ারের নিচের খোপে দেখেছিলাম কয়েকটা।

—তো সেটা নিজে উঠে নিতে পারছ না?

শীলার কণ্ঠস্বরের এমন তিক্ততা সত্ত্বেও স্মরণ হাসে, শীলার অজ্ঞ-অভিযোগের পালটা জবাবে। সৃষ্টির সঙ্গে আলস্যের সম্পর্ক শীলা জানে না। অথচ জানা উচিত ছিল। পোয়াতি হওয়ার দীর্ঘ উদ্বেগময় যন্ত্রণায় তো ওরা অভিজ্ঞ। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কেন কিছুদিনের জন্যে নির্জীব হয়ে যায় জীবন, কেন আলস্যই

হয়ে উঠতে চায় চুরমার শরীরের প্রিয় পথ্য, শীলাদের তো সেসব মর্মান্তিকভাবেই জানা। অথচ অন্য সৃষ্টির বেলায় ওদের মনে পড়ে না যে সেখানেও থাকতে পারে অস্তিত্ব-নিংড়োনো নির্যাতন।

—আলপিন না দিতে পার তো এক কাপ চা দাও। সত্যি, বিশ্বাস কর, সারা শরীর কামড়াচ্ছে।

—এমন অবেলায় আবার চা কিসের? চা তো খেয়েছ, একবার নয় দু বার।

—আমার নড়বার ক্ষমতা নেই।

—আজও আপিস কামাই নাকি?

—আপিস যাব না কেন? কটা বেজেছে?

—সাড়ে নটার কাছাকাছি হবে।

—যাঃ, সাড়ে নটা কি করে বাজবে এখুনি? সময় কি দৌড়চ্ছে নাকি?

শীলা ড্রয়ার টেনে ঘড়িটা বের করে। নিজে একবার দেখে কয়েক পা এগিয়ে স্মরণের মুখের সামনে।

—সে কি, নটা আটত্রিশ? মাই গড্। না, চা চাই না। খাবার রেডি কর।

স্মরণ ফুটবলের মতো লাফিয়ে ওঠে বিছানায়।

২

এটাও একটা প্রমাণ, ভিড়ের সময়ের লোক্যাল ট্রেনে বসার এই জায়গা পেয়ে যাওয়াটা, আজ খুবই শুভদিন।

দুই বিহারী মজুরের মাঝখানে বসার জায়গা পেয়ে স্মরণ ভাবে। এমন-কি, সে আরো ভাবে, দু পাশে দুই বিহারী জুটে যাওয়াটাও' শুভ লক্ষণ। এখন সে নিশ্চিন্তে ব্যাগ থেকে পাণ্ডু-

লিপিগুলো বের করে শেষবারের মতো চোখ বুলিয়ে নিতে পারে। কেননা ওরা কখনোই আড়চোখে সাহিত্যের অক্ষরের দিকে তাকায় না। স্মরণ এই নির্দিষ্ট ট্রেনের নিত্যযাত্রী। অধিকাংশ দিনই দাঁড়িয়ে, ডাইনে বাঁয়ে সামনে-পিছনে পিণ্ড-পাকানো ভিড়ের ধাক্কায় কখনো লম্বা কখনো গোল, কখনো মচকানোর ভঙ্গিতে, নিজের অসহায় অস্তিত্বকে পুরোপুরি ভিড়ের হাতে ছেড়ে দিয়েই, তার যাতায়াত। এই সময়টুকু, কোন্নগর থেকে হাওড়া স্টেশানে পেঁছিতে যতটা সময় লাগে বৈদ্যুতিক ট্রেনের, স্মরণ ফণা গুটিয়ে রাখে। তার ব্যক্তিগত অহংকার, স্বাধিকার, স্বেচ্ছাচারের চেয়ে, এই সময়ে অনেক বেশি মূল্যবান হয়ে ওঠে কাঁধের ঝোলা, চোখের চশমা, পকেটের মানিব্যাগ। আর এই সময়টুকু তাকে অদ্ভুতভাবে সাহায্য করে বাস্তবতার বিরুদ্ধে আরো বেশি রকম বিরক্ত ও বিদ্রোহী হয়ে উঠতে। এই কর্কশ, কঠিন, ইতর, অশালীন বাস্তবতার ভিতর থেকে সে কোনো অমৃত পাবে না জেনেই, নিজের সংকল্পে দৃঢ়তর হয় আরো। বাস্তবতাকে অস্বীকার করার সংকল্প। বাস্তবতার প্রতিপক্ষরূপে ভিন্ন মানচিত্র গড়ে তোলার সংকল্প।

'এইভাবেই আমার প্রতিশোধ।
তোমরা যখন রেলগাড়ির কামরায়
নিজেদের হাড় চিবোও,
আমি তখন বৃক্ষরোপণ করি
সেই সব ঊরুর ভাঁজে ভাঁজে
যাদের মসৃণ উলঙ্গতা
এখনো ফিস ফ্রায়ের মতো সুস্বাদু করে রেখেছে
তোমাদের আকাশ।'
অথবা
'ভাস্বতি,

তোমার সুড়ঙ্গপথে রত্নখনিময় মহাদেশকে পেয়েছি বলেই অনায়াসে আমার শিরদাঁড়ার উপর পেতে দিতে পারি এই সব দুষ্কৃতকারী ট্রেনের লাইন।'

স্মরণ এইভাবেই, বাস্তবতার বিরুদ্ধে বদলা নেয় তার কবিতায়।

পাণ্ডুলিপি থেকে চোখ সরিয়ে স্মরণ একটা সিগারেট ধরায়। আর এমনভাবে ধোঁয়া ছাড়ে যেন চোখের সামনের শূন্য পটভূমিকাটাকে সে নিকিয়ে পরিশুদ্ধ করে নিতে চাইছে বিশেষ প্রয়োজনে। ঠিকই। এখন তার মধ্যে ভবিষ্যৎকে দেখার বড় আকুতি। বিশেষত কবিতাগুচ্ছটিকে কেন্দ্র করে আজ সন্ধের আড্ডায় যে নাটকীয় উন্মাদনা ঘটবে, সেই সূর্যোদয়-সদৃশ দৃশ্যটাকে আগাম দেখে নেওয়ার জন্যে তার রক্তস্রোত খর নদীর মতোই অস্থির।

সিগারেট খাওয়া শেষ করেই সে পাণ্ডুলিপিগুলোর দিকে আর তাকায় না। পরিবর্তে বেছে নেয় যোগাসন-সুলভ ভঙ্গি। কাঁধে ঝোলানো যে-ব্যাগের মধ্যে কবিতার পাণ্ডুলিপি, সেটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে কোলের উপর রাখে। তার পর হাত দুটোকে, যেন অদৃশ্য কোনো কিছুকে প্রণাম, এমনি করজোড়ে সেই ব্যাগের উপর। মাথাটাকে ঠেলে দেয় পিছনে, ট্রেনের কাঠের দেয়ালে। কাঠ এবং মাথা দুটোই শক্ত বলে তাদের মধ্যে কোনো হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। মাথাটা, কাঠের সহানুভূতিহীনতায়, গাড়ির দুলুনির সঙ্গে ডাইনে বাঁয়ে দোলে। এর পর, এইটুকু সময়ে কামরাটা এমন গুদাম-ঠাসা হয়ে গেল কি করে, কোলের বাচ্চাটিকে নিয়ে বেঁটেখাটো মহিলাটি ধরবার মতো অবলম্বন না পেয়ে দুলছে, কোনো সময় তার উপরে হুমড়ি খাবে না তো, শুঁটকি মাছের মতো আঁশটে গন্ধটা আসছে কোন দিক থেকে, যাঃ বাবা, বিয়ের বরকনেও লোক্যাল ট্রেনে, চালের বস্তা নিয়ে ওঠা এক পাল আধা-উলঙ্গ মহিলা যাত্রীদের পায়ের তলায় উপুড়, বস্তা-

গুলোকে সীটের তলায় চালান করতে, এই জাতীয় দৃশ্যের সমগ্রতার উপর তাকানোটা একবার ছড়িয়ে দিয়ে সে চোখ বুজিয়ে নেয়। কল্পনার অভ্যন্তরে অপেক্ষমান নাটকের সম্মুখবর্তী হওয়ার জন্যে এখন সে চূড়ান্ত রূপে প্রস্তুত। অবাঞ্ছিত পরিবেশ থেকে তার বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণ।

দ্রুতগামিতার জন্যে মন বহুদিন থেকেই বিখ্যাত। সুতরাং মনের ঘোড়া স্মরণকে এক নিমেষেই পৌঁছিয়ে দেয় অক্রূর দত্ত লেনের ছাপাখানার অন্ধকার খুপরিতে। এর পর ধাপে ধাপে নিজের দিবা-স্বপ্নে ক্রমশ সম্রাট হতে থাকে স্মরণ, তার বন্ধু-মণ্ডলীর উষ্ণ আবহে।

৩

হাওড়া স্টেশনে নেমে আরো একবার শুভদিন কথাটা মনে আসে স্মরণের। কারণ আজ এক মিনিটও লেট করে নি লোক্যালটা, যা প্রায় অবিশবাস্য রকমের ব্যতিক্রম।

বাসে উঠে সে অবশ্য ট্রেনের মতো বসার জায়গা পায় না। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকার পক্ষে বেশ স্বচ্ছন্দ একটা জায়গা পেয়ে যায়। এমন-কি ঠেস দেওয়ার যোগ্য লম্বমান একটা রডও। অন্য দিনের মতো তার শরীরটাকে নিয়ে কেউ চটকাবে, সে সম্ভাবনাটা খুবই কম।

সবই যেখানে শুভ, সেখানে বিষণ্ণতা অস্বাভাবিক। অথচ স্মরণের মুখে এক ধরনের বিষণ্ণতা। সে বিষণ্ণতায় তুমুল কোনো ভাঙন নেই ঠিকই, কিন্তু ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে অবিরল সরু জলরেখার চুইয়ে পড়ার মতো বিরক্তিকর অস্বস্তি।

কোনো একটি, কখনো কখনো অবশ্যই একাধিক, কবিতা লেখা হয়ে যাওয়ার পর, কবিতাগুলো সম্পাদকের হাতে তুলে দেওয়ার

পরও, বেশ কয়েকটা দিন কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলোকে মনে মনে আউড়ে যাওয়া, আর সেইসঙ্গে মনে মনেই এক ধরনের হিসেব-নিকেশ সাফল্য-অসাফল্যের, অর্থাৎ কৃতকার্যতার, কোন্ পঙ্‌ক্তিতে তুরুপের তাস, কোন্‌টা বাজি মাৎ করার উপমা ইত্যাদি ভেবে চলা, স্মরণের স্বভাবে এক স্থায়ী অভ্যেস। এখন, এই আপিস যাত্রী বোঝাই স্টেটবাসে, একটু আগে কোন্নগর স্টেশনের প্লাটফর্মে, পরে ট্রেনের কামরায়, যতবারই সে কবিতার এবং বিশেষ করে কবিতা-গুচ্ছের তুখোড় পঙ্‌ক্তিগুলোকে মনে করতে চেয়েছে, বাড়ি থেকে বেরোবার আগে পর্যন্ত তাদের গায়ে যে বিদ্যুৎ-চমক ছিল, তা বেশ ম্রিয়মাণ। অবশ্য এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। এ-অভিজ্ঞতা পুরনো। কবিতা রোদ এবং জনসমাগম এবং উন্মুক্ত লোকালয়ে ঈষৎ ফ্যাকাসে। কবিতার অন্তর্গত অনেক অহংকারই তখন স্যাঁতসেঁতে এবং শ্যাওলা-ধরা। দোর্দণ্ড কোনো উক্তিকে বরং আরো বেশি করে মনে হয় অকিঞ্চিৎকর।

সুতরাং আমার, স্মরণ নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে ভাবে, মুষড়ে পড়ার কোনো কারণ নেই। উটের গ্রীবার মতো যে অহংকার আমাকে আমার চেয়ে অনেক লম্বা করে রাখে, তার সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হওয়াটাও অকারণ। স্মরণ তার মুখাবয়ব থেকে বিষণ্ণতা এবং ঘাম দুটোকেই একসঙ্গে মুছে ফেলতে চেয়ে পকেটের রুমালটাকে টেনে আনে মুঠোয়।

বাসটা এখন হাওড়া ব্রিজে। আকাশ অনেক দূরে। আকাশ এবং ব্রিজের মাঝখানে নদী, বজরা, হলুদ জল, চলমান স্টিমার আর জাহাজের জটিলতাময় রেখাচিত্র। ইতস্তত ভাসমান বয়া চোখে পড়ে কয়েকটা। বয়ার দিকে তাকিয়েই স্তনের ইমেজ মাথায় এসে যায় তার। জলস্রোতে ডুবে যাওয়া কোনো নারীর স্তন যেন।

স্মরণ অভিভূত হয়ে যায় অতি সাধারণ দৃশ্যের ভিতরে এমন মায়াবী ছবি খুঁজে পেয়ে। সব সময় ঘটে না। কদাচিৎ মানুষের

চোখে অভ্রের সেই উজ্জ্বলতা , যা যেকোনো তুচ্ছ বস্তুতে উদ্ঘাটন করে সৌন্দর্যের সফল উপকরণ। সে একটা ঘোরের সময়। অলৌকিক কোনো শক্তি তখন ভর করে চেতনায়। আর চেতনা তখন এমনই ক্ষুধার্ত যে, অতি নগণ্য বস্তুকেও রূপান্তরিত করে নিতে পারে নিজের সুস্বাদু আহার্যে।

স্মরণের চেতনার স্তরে কাঁপুনি জাগে। সে কাঁপুনি জলের তোড়ের নয়, যা এসে ধাক্কা মারে, ভাঙে, গলিয়ে দেয় ডাঙার মাটি। সে কাঁপুনি পটুয়ার হাতের, দেবীমূর্তির সাদা মুখের উপরে চোখের রেখার নিটোল টানের মুহূর্তে। অর্থাৎ কবিতায় একটি পঙ্ক্তি বা স্তবক নির্মাণের আকুতি এখন তার ভিতরে। স্মরণকে এখন খুঁজতে হচ্ছে সেই সব শব্দ যা পাখির ঝাঁকের মতো উড়ে বেড়ানো অগোছালো অনুভূতিমালাকে বাঁধতে পারে সুস্থির কোনো অবয়বে। জলের গভীর থেকে যে-ভাবে বুদ্বুদ্ সেইভাবে শব্দের ইতস্তত উত্থান এখন স্মরণের চেতনায়।

প্রাচীন শতাব্দীর···

বাসটা ব্রিজ পার হয়ে ফ্লাইওভারে ওঠে। বাঁকের মুখে টাল খায় স্মরণের শরীর। প্রাচীন শতাব্দীকে মুছে দেয় সে।

শত শত শতাব্দীর

কার একটা কনুই গোঁত্তা মারে স্মরণের ঘাড়ে। স্মরণ ঘুরে তাকায়। ঘুরে তাকানোর সময় পিছনের ভদ্রলোকের শরীরটা বেঁকে স্মরণের শরীরটাকে আচমকা ঠেলে দেয় সামনের সীটে বসে থাকা যাত্রীর প্রায় ঘাড়ের উপর।

—কি করছেন বলুন তো ? চশমাটাই তো ভাঙতো এখুনি।

—কি করব বলুন। দেখুন-না, কী ভাবে পিছন থেকে ধাক্কা মারলেন।

—আমি মশাই আপনাকে ধাক্কা মারি নি। আমাকেই বরং ধাক্কা মেরে নামছেন ওঁরা।

পুনরায় কবিতায় ফিরে আসে স্মরণ, তালভঙ্গ অথবা ধ্যানভঙ্গের এক মুখ বিরক্তি দিয়ে।

শত শত শতাব্দীর মৃত নারী

—আপনিই বা ওভাবে রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

—কোথায় দাঁড়ালে রাস্তাটা আগলানো হবে না বলতে পারেন? বাসের তো সর্বাঙ্গই রাস্তা মশাই।

—আরে মশাই করছেন কি। পা-টা যে থেঁৎলে, ওঃ, হ্যেৎ

—আপনি ধাক্কা মারলেন যে?

—বেশ করেছি। আবার মারব দরকার হলে। আমার পা-টার কী দশা করেছেন দেখুন তো?

সামান্য ফাঁক পেয়ে স্মরণ সরে যায় তার বাঁয়ে। কান সরিয়ে নেয় চিৎকার থেকে।

শত শত শতাব্দীর মৃত নারী মিশে গেছে

নক্ষত্র আঁধারে···

—আরে কি করছেন মশাই? মারামারি করছেন কেন? ছাড়ুন, ছাড়ুন, কি কাণ্ড!

—খুব গায়ের জোর দেখাচ্ছিলেন না?

—তাই বলে আপনি একজন বয়স্ক, আপনার বাবার বয়সীকে···

—আপনি চুপ করুন, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলি না।

—ওহে ছোকরা, বেশি রোয়াব দেখালে তোমাকে···

মারামারি এবং উত্তেজিত বাক্-বিতণ্ডার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই স্মরণ ফিরে যেতে চায় কবিতায়।

শত শত শতাব্দীর মৃত নারী

এটা জমছে না, স্মরণ বুঝতে পারে। আগাগোড়া ভেঙে সাজায়।

বহুদূরে শতাব্দীতে মরে গেছে যে-সব নারীরা

এখনো তাদের স্তন

—কি হলো ড্রাইভার দাদা, আপনি আবার থেমে গেলেন কেন ?

—রথ যে আর নড়ে না।

—ড্রাইভার কি ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি ?

—এইজন্যেই লোকে ঠেঙায়।

—চিৎকার করছেন কেন মশাই ? দেখছেন না সামনে জ্যাম।

—ওহে মুখুজ্যে, নেমে পড়ো, এ যা জ্যাম রাত বারোটার আগেও কাটবে কিনা সন্দেহ।

—কি হয়েছে দাদা, জ্যাম কেন ?

—ওহো, তাই তো, আজকে তো রাইটার্স দখলের অভিযান।

—তা হলে তো হয়ে গেল।

বাসটা একটু একটু করে খালি হতে থাকে। স্মরণ এখন স্বচ্ছন্দে বসতে পারে। বসার আগে হাতল ধরে ঝুঁকে বাইরের দিকে তাকায়। যতদূর চোখ যায় কেবল গাড়ি। গাড়িরই একটা থমকানো স্রোত। তাদের বাসটা থেমেছে চীনে বাজারের কাছে। স্মরণ অপেক্ষা করতে চায়। যারা নামছে নামুক। আরো ফাঁকা হয়ে যাক্ বাসটা। বাসে একটু অপেক্ষা করলে হয়তো উদ্গত স্তবকটা পেয়ে যাবে সম্পূর্ণ চেহারা। কবিতাগুচ্ছের যে-কোনো একটায়, যেটায় বেশি মানাবে, জুড়ে দেওয়া যাবে আপিসে গিয়ে।

ক্রমে পুরো বাসটাই খালি। আরাম করে বসার, এমন-কি শুয়ে পড়ার, জায়গা এখন সর্বত্র। স্মরণ যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই বসে। সব কিছুই আজ তার কাছে শুভ। এই কলকাতা শহরে, ব্যতিব্যস্ত আপিস টাইমে একটা জ্যান্ত বাসের মধ্যে সে একা, এমন ঘটনা প্রায় স্বপ্নাতীত। অর্থাৎ এও এক দৈব ইশারা।

স্মরণ, এবারের কবিতাগুচ্ছই তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে সার্থকতার শিখরে। নারী এবং প্রধানত নারীর শরীরকে মৃত্যু-

হীনতায় পেঁছে দেওয়ার যে ব্রত নিয়েছ তুমি, তার জয় অবধারিত। তুমি লড়ে যাও।

নিজের ভিতরে এই দৈববাণী শোনে সে।

আমি সুখী, এই ভরাট উচ্চারণ মানুষের জীবনে বড় দুর্লভ। অথচ সে উচ্চারণ প্রতিদিনই গাছে ও ফুলে পরিপূর্ণ। নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা আজ স্বরণকে উপহার দিয়েছে সেই দুর্লভ। স্মরণ এখন অনায়াসে গোটা কলকাতা শহরের উপর ছুঁড়ে দিতে পারে এই ঘোষণা, একজন সুখী মানুষের মুখের আদল দেখে নিতে পারো তোমরা।

দৈববাণী ফুরিয়ে গেলেও তার রেশ লেগে থাকে স্মরণের মনে, মৃত্যু হয়ে গেলেও আরো কিছুক্ষণ যে ভাবে ডানা ঝাপটায়, মাছ অথবা পাখি। দৈববাণীর সঙ্গে আরও দুটি একটি কথা এই ফাঁকে বলে নিতে পারলে সুখ সম্বন্ধে প্রায় সুনিশ্চিত হওয়া যাবে ভেবে সে প্রশ্ন করে

—কিন্তু স্থায়িত্ব ?

—তোমার ক্ষেত্রে আজীবন।

—অর্থাৎ যতক্ষণ আছি। যখন শরীরে নেই অর্থাৎ মৃত ?

—আমি মৃত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এর উত্তর দিতে পারে তোমার সমগ্র জীবনচর্চা।

—আর শত্রুতা ? মানে সমালোচনা ?

—সেটা নির্ভর করছে তোমার উন্মোচনের উপর।

—আমার পূর্ববর্তীরা কেউ কেউ বলে গেছেন 'যা কিছু ব্যক্তিগত, তাই পবিত্র'। আমি এই স্লোগানকেই উত্তীর্ণ করে দিতে চাই আরো তান্ত্রিক গূঢ়তায়—'যা কিছু নগ্ন, তাই-ই উন্মোচনযোগ্য।' এ কি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক ?

কোনো উত্তর আসে না। অর্থৎ দৈববাণী নিঃশেষিত।

স্মরণ রিস্টওয়াচ দেখে। না, আর দেরি করা উচিত নয়।

এ ক্ষেত্রে এক ইঞ্চিও নড়ে নি বাসটা। অতএব হেঁটেই পৌঁছতে হবে আপিসে। আপিসে পৌঁছেই কী যেন একটা কাজ ভেবেছিলুম একটু আগে? কী কাজ যেন? সুজনকে ফোন? না, তার চেয়েও অনেক দামী, জরুরি, আবেগপ্রধান কাজ। জামসেদপুরে কমলকে কবিতা পোস্ট করা? না, আরো অন্যরকম। ও, হ্যাঁ, ঐ স্তবকটা সম্পূর্ণ করা। কি যেন ছিল, এই তো একটু আগে গড়ে উঠেছিল, ভুলে গেলাম?

স্মরণ বাস থেকে নেমে হাঁটে। হাঁটতে গিয়ে ভিড়ের মানুষ থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে না, যা তার আন্তরিক প্রয়োজন এখন। কারণ এই হাঁটার ফাঁকেই যদি স্তবকটাকে সম্পূর্ণ পেয়ে যায়, জুড়ে দেবে কবিতাগুচ্ছে। কিন্তু মানুষের শরীরের এত ঘষাঘষি, ধাক্কা, ঠেলাঠেলিতে স্মরণ কিছুতেই হারিয়ে যাওয়া স্তবকটাকে মনে আনতে পারে না, স্মৃতি তছনছ করেও। যে-সব নারীরা মৃত? না। মৃত সব নারীদের স্তনরেখা? না। জলের গভীরে নারী ডুবে গেছে, শুধু তার স্তন?

এই সময়ে দূরে বজ্রপাতের শব্দ।

স্মরণ আকাশের দিকে তাকায়। আকাশ যেন উপবিষ্ট নগ্ন রমণীর মসৃণ পিঠ। মেঘের ছোটখাটো তিল-চিহ্নও নেই কোনোখানে। শব্দটা তা হলে আকাশের নয়, এই ভেবে সে চোখ নামায়। দূরে অজস্র পতাকা চোখে পড়ে তার। পতাকা-রাঙানো দিগন্ত। বাতাসের আন্দোলনে অস্থির। এই সময় রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের কথাটা মনে পড়ে যায়। সেও শুনেছিল বটে। কিন্তু দিনটা মনে ছিল না। বাসেই প্রথম শুনল।

আবার বজ্রধ্বনি। পর পর, একাধিক।

স্মরণের পায়ের মাটিতে কাঁপন। এবার এগুতে গিয়ে বাধা পায়। মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে। মানুষে মানুষে এক দুর্ভেদ্য দেয়াল। রাইটার্স বিল্ডিং-এর লাল বাড়ি এখন তার সামনে। সে

লাল বাড়িটার দিকে তাকায়। ছাদের উপরে অনেক মানুষ। ঝুঁকে আছে নিচের দিকে। কি দেখছে ওরা ? তেরঙা পতাকার নাচ ? নাকি অন্য কিছু ? হঠাৎ স্মরণ আছড়ে পড়ে মাটিতে। তার সামনের কিছু লোক দ্রুত পিছনে ছুটতে গিয়েই ধাক্কা মেরেছে তাকে। স্মরণের পায়ের উপর লাথি মেরেও চলে যায় কয়েকজন। খুব দ্রুত উঠে না দাঁড়ালে আরো এক লক্ষ পা তাকে মাড়িয়ে যাবে এখুনি, এক নিশ্বাসে এটা বুঝে নিয়েই সে বাঁ হাতের তালুতে ভর দিয়ে, বেঁকে শরীরের সমস্ত শক্তিকে কোমরে এনে লাফ দিয়েই উঠে দাঁড়ায়। আরো দ্রুত গতিতে রাস্তা থেকে ফুটপাতের দিকে সরে যেতে চায়। যে মানুষগুলো সামনে এগোচ্ছিল তারাই এখন পিছনের দিকে দৌড়াচ্ছে। বাতাসে ক্রমাগত বিস্ফোরণের শব্দ। পলায়নমুখর মানুষের মুখ থেকেই শুনতে পায় ভয়ংকর কয়েকটি শব্দ ঃ

—টিয়ার গ্যাস ছেড়েছে। পালান মশাই, পালান।

—দেখছেন কী রকম বোমাবাজির বহর ?

—সরে পড়ুন, সরে পড়ুন। গুলি চলবে এখুনি।

—এরাই আবার ডেমোক্রেসি···দাঁড়াবেন না দাদা···

—কি হবে আবার ? দেখছেন না পুলিস তাড়া করেছে। লাঠিচার্জ।

দ্রুত ঝাঁপ বন্ধ হচ্ছে দোকানের। ঝাঁপ বন্ধ, শার্টার টানার শব্দ, মানুষের এলোমেলো চিৎকার, মন্তব্য, বোমা, বন্দেমাতরম্, লাঠিচার্জ, যুগ যুগ জিও, দৌড়ানো মানুষের পায়ের শব্দ, পুলিসী মোটর বাইকের গর্জন ইত্যাদি মিলে মিশে শব্দের এক ভয়াবহ উত্থান এখন।

জ্বালা ঢুকে, চোখে জল আসে স্মরণের। মনের জ্বালা নয়, টিয়ার গ্যাসের জ্বালা।

—নামুন দাদা, নামুন। দোকান বন্ধ করব।

স্মরণ আশ্রয় নিয়েছিল একটা কাপড়ের দোকানে। সে এবং আরো কয়েকজন। স্মরণকে রাস্তায় নামতে হয়। রাস্তা জুড়ে এক হাড়ুডু খেলা। বিভিন্ন ঝাঁকে মানুষ ইতস্তত দৌড়চ্ছে। দৌড়ে থেমে যাচ্ছে। থেমে আবার ফিরে আসছে। আবার দৌড়। কারা যেন ইট ছুঁড়ছে পুলিসের কালো ভ্যানের উপর। সেই প্রকট শব্দের সঙ্গে লাঠিচার্জের খটখাট আওয়াজ।

রুমালে চোখ মোছে স্মরণ। চোখ বগড়াতে ইচ্ছে করে। কি করবে সে এখন? এগোবে না পিছোবে? ভয়াবহ মৃত্যু-শব্দটা এখন একটু ঝিমোনো। জনতার দৌড়-ঝাঁপ থিতিয়ে এসেছে একটু। এই ফাঁকে পা চালিয়ে এগিয়ে যাওয়াই ভালো। সোজা হাঁটাটা এ সময় নিরাপদ নয়। সে ঠিক করে ডান হাতি রাস্তা অর্থাৎ রাইটার্সের পিছন দিয়ে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দিকে এগিয়ে যাবে।

সেইভাবে সে এগোয়। এ রাস্তাতেও ভিড়। মানুষের ত্রস্ত হাঁটা। লাল মোটর বাইকে সার্জেন। কালো ভ্যান। থমথমে চেহারা। বেশ জোরেই হাঁটে স্মরণ। যত এগোয়, ততই একটা গর্জনের ধ্বনি সুস্পষ্ট হয়। হঠাৎ, একটু আগে যেমন ঘটেছিল, আবার শুরু হয় জনতার দৌড়, উল্টোমুখে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দিক থেকে একটা তুমুল জনস্রোত ছুটে আসছে। গুলির শব্দ। বোমা, চিৎকার, আর্তনাদ। আবার মৃত্যুশব্দ। মূর্খের মতো তবুও এগোতে চায় স্মরণ। এবং হারিয়ে যায়।

সে ফুটপাতে উপুড়। তার উপর দিয়ে জনস্রোত ছুটে গেছে। তার চশমা ভাঙা। তার হাত এবং পা ক্ষত-বিক্ষত। শার্ট ছেঁড়া। তার চারপাশে মানুষ উল্টোপাল্টা দৌড়চ্ছে। কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না। প্রত্যেকেই ভীত এবং যে-কোনো দিকে পালানোর জন্যে ব্যস্ত।

স্মরণ এখন স্মৃতিহারা। তার চেতনার জগতে একমাত্র শরীর

ছাড়া আর সবকিছু অনুপস্থিত। ফুটপাত ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে চায় সে। বাঁ হাতটা, যা ফুটপাতে ছড়ানো, গুটিয়ে আনে ভাঁজ করার জন্যে। ভাঁজ করার মুহূর্তে তার গোটা শরীর মুচড়ে ওঠে যন্ত্রণায়। যেন হাড় নেই। হাতের সবটাই থেঁৎলানো। বাঁ হাতকে বাদ দিয়েই সে ওঠার চেষ্টা করে। উপুড় হওয়া শরীরটাকে উল্টো দিকে মোচড়ায়, কোমরে ভর দিয়ে বসা যায় যাতে। যন্ত্রণা বিদ্যুৎশিখার মতো যাতায়াত করে সারা শরীরের শিরা-উপশিরায়। ছিঁড়েও যেতে পারে যে-কোনো মুহূর্তে বুঝি-বা। তার দীর্ঘ সময় লাগে কোমরে ভর দিয়ে বসতে। বাঁ হাতের পরিবর্তে এবার তাকে ভর দিতে হয় ডান হাতে। ডান হাতটা ভাঁজ করার সময় গোটা শরীরটা কুঁকড়ে যায় যন্ত্রণায়। সে ডান হাতের দিকে তাকায়। কনুই-এর কাছটা রক্তাক্ত। ছ-সাত ইঞ্চি ছড়ে গেছে। তবু বাঁ হাতের চেয়ে ডান হাতেই বেশি জোর পায় বলে ডান হাতটাকে ফুটপাতে রেখে, ডান হাতের জোরে কোমরটাকে শূন্যে তোলার চেষ্টা করে। আর তৎক্ষণাৎ আবার এক যন্ত্রণার বিদ্যুৎ।

চোখে আলো লাগলেই কষ্ট। এখনো চোখের ভিতরে টিয়ার গ্যাসের প্রতিক্রিয়া। হাত ময়লা। পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ দুটো মুছতে এবং ঈষৎ রগড়ে নিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু দুটো হাতের কোনোটাতেই রুমালের দিকে অর্থাৎ জামার পকেটের দিকে ঘোরাতে পারে না। শেষ পর্যন্ত জামার অংশ দিয়েই চোখ রগড়ে নেয়। তার পর তাকে বারংবার চেষ্টা করে যেতে হয়, কোমরটাকে শূন্যে তুলতে, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া সত্ত্বেও।

শরীর সম্বন্ধে এখন এক অদ্ভুত জাগরণ তার চেতনায়। যেন অন্য একজনের আহত-শরীর, এইভাবে নিজের দিকে তাকায় সে। জীবনে এই প্রথম যেন একটি আহত অর্থাৎ ছিন্নভিন্ন মানুষের শরীরকে নিবিড় কাছে পেয়েছে সে। সহানুভূতিতে তার চোখ দুটো, টিয়ার গ্যাসের জ্বলুনি সত্ত্বেও, তাই উজ্জ্বল। আহত

মানুষটির রোগা রোগা শিরাবহুল হাত-পা, এমন-কি জামা-কাপড়, যা এখনো রক্তে ও ধুলো-ময়লা আবর্জনার ছোপে কদর্য, সেও মায়া-মমতার যোগ্য মনে হয় তার। বস্তুত এই মুহূর্তে তার চেতনায় নতুন এক সৌন্দর্যবোধের জন্ম হতে থাকে যেন। এমন-কি যে-ভালোবাসা দিয়ে কবিতায়, বিশেষ করে এবারের কবিতাগুচ্ছে, সে রচনা করেছে নারীর নগ্নতার অভ্রদীপ্তি, সেই ভালোবাসা এবং মনোযোগও এই আহত মানুষটিকে উপঢৌকন দিতে প্রস্তুত হয় সে, মনে মনে। মৃত্যু-আঘাত থেকে ধীরে ধীরে একটি আহত মানুষের শরীরে রক্তস্পন্দন ফিরে আসছে, একটি রক্তাক্ত হাত বাতাসে গাছের শাখাপ্রশাখার মতো, দুটি দগ্ধ চোখ সূর্যের আলোর তীব্রতাকে সইতে পেরে আবার উন্মীলিত, এই বোধ অথবা অনুভব তাকে অবিকল নারীর শরীরের দিব্যতার মতোই মুগ্ধ করে।

চতুর্থ বারের চেষ্টায় সে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে জুতোর অর্থাৎ নিজস্ব স্যাণ্ডেলের খোঁজ করে। ফুটপাতে ইতস্তত ছড়ানো কিছু জুতো চোখে পড়ে তার। নিজের কোনটা দেখতে এবং বুঝতে পারে না। সেই মুহূর্তেই তার মনে পড়ে কাঁধের ব্যাগের কথা। সে ব্যাগ দেখতে পায় না। উন্মত্ত কোনো জন্তুর চিৎকার বেরিয়ে আসে তার গলা ছিঁড়ে।

—আমার ব্যাগ ? আমার কবিতাগুচ্ছ !

তার আর্তনাদ ডালহৌসীর গরম হাওয়ার, মানুষের দৌড়ের, শ্বাসকষ্টের, দূরের স্লোগানের, বোমার, লাঠির, অন্য অনেকের আর্তনাদের, মোটরবাইকের গর্জনের ভিতরে ক্রমাগত মিলিয়ে যেতে থাকে।

প্লিজ স্টপ

—তুমি মিথ্যুক। তোমার সঙ্গে কথা বলবো না।

—কেন ?

—তুমি বলেছিলে রঙের বাক্সো কিনে দেবে ? দিয়েছো ?

—দেবো, সামনের মাসেই। মাইনে পেলেই আগে তোমারটা।

—তুমি দেবে না ছাই। তুমি অমন বলো।

—কেন, দিই নি তোমাকে কিছু ?

—ছাই দিয়েছো। টুকুলের বাবা টুকুলকে কেমন সাইকেল কিনে দিয়েছে। কি সুন্দর লাল।

—লালের ইংরেজি কি ?

—রেড।

—আর সুন্দরের ?

—বিউটিফুল।

—বাঃ, অনেক ইংরেজি শিখে গেছো তো।

—আর শিখবো না।

—কেন, শিখবে না কেন ? ও রকম বলতে নেই।

—তুমি কেন মিথ্যে কথা বলবে ?

—আবার কি মিথ্যে বললুম ?

—তুমি মাকে বলেছিলে ফ্রীজ কিনে দেবে। দিয়েছো ?

—দেবো তো।

—তুমি দেবে না।

—দেবো না ? তুমি একদম জেনে গেছো যে দেবো না ?

—আমার সব বন্ধুদের বাড়িতেই ফ্রীজ আছে। টি. ভি. আছে। আমার বন্ধুরা সবাই টি. ভি.-তে কত কি দেখে। আমিই

দেখি না। ওদের বাড়িতে কত ফানিস্ থাকে। তুমি কখনো কিনে দিলে না আমাকে, ফানিস্।

—ফানিস্ কি ?

—এ মা তুমি ফানিস্ জানো না ?

—কি বলতো ?

—তুমি টিনটিন পড়নি বুঝি ? টারজান, ম্যানড্রেক পড়নি তুমি ?

—না, আমরা তোমার বয়সে ঠাকুমার ঝুলির গল্প শুনতাম।

—ঠাকুমার ঝুলি ? সে কিসের গল্প ?

—ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি, রাজপুত্র আর রাজকন্যার গল্প। তোমাকে তো কিনে দিয়েছিলুম একটা। পড়নি ?

—ওসব বই আমার ভালো লাগে না।

—কি রকম ভালো লাগে ?

অনেক ছবি থাকবে, রঙ থাকবে, বন্দুক থাকবে, এরোপ্লেন থাকবে, যুদ্ধ হবে। খুব মারামারি থাকবে। ফায়ারিং হবে। দুম্ দুম্ দুম্। জানো তো আমাদের ক্লাসে একটা ছেলে কি দুষ্টু। ক্লাসে বন্দুক ছুঁড়েছিল। মিস দেখতে পেয়ে বকে দিয়েছিল খুব। ছেলেটা কিন্তু ভীষণ গোঁয়ার। ওর ব্যাগের মধ্যে রোজ বন্দুক থাকে। ও কি বলে জান তো ?

—কি ?

—মিসকে নাকি গুলি করবে একদিন। গুলি করলে মিস মরে যাবে। তারপর ওর জেল হবে। ও তখন সুপারম্যান হয়ে জেল থেকে পালাবে ডিনামাইট দিয়ে জেলটাকে ভেঙে। সত্যি কথা ?

—কোনটা ?

—ডিনামাইট দিয়ে জেলখানা ভাঙা যায় ?

—না। তোমাকে ভাবতে হবে না ওসব।

—তাহলে বইয়ে ওসব লেখে কেন ?

—কোন বইয়ে ?

—ফানিসে।

—ও সব তো পড়ার বই নয়। গল্পের বই। গল্পের বইয়ে যা লেখে সব সত্যি নয়। আর কথা বলতে হবে না। যাও, একটু হ্যান্ডরাইটিং করো। তোমার হ্যান্ডরাইটিং কিন্তু খুব খারাপ। ইমপ্রুভ করছে না একদম।

—বাঃ রে, আজ আবার লিখতে বসবো কখন ? মা এলে আমি তো বেরোব।

—কোথায় ?

—তুরির বার্থ ডে নয় আজ ? তুমি ভুলে গেছো। তুমি সব ভুলে যাও।

—ও, বলেছিলে বটে একদিন।

—আমি জানি, তুমি আমাকে কালার বক্স কিনে দিতেও ভুলে যাবে। টি. ভি. কিনতেও ভুলে যাবে। কমিকস্ কিনতেও ভুলে যাবে। মা তোমার চেয়ে অনেক ভালো।

—মা বুঝি তোমার বার্থ ডে প্রেজেনটেশান কিনতে গেছে ?

—না। মা গেছে গার্গি মাসীমার বাড়ি। সেখান থেকে বি. ডি. মার্কেটে যাবে আমার জন্যে প্রেজেনটেশন কিনতে।

—নিশ্চয় একটা লম্বা লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছো মাকে ? কিন্তু মায়ের কাছে যদি টাকা পয়সা না থাকে অত ?

—কেন, থাকবে না কেন ?

—টাকাপয়সা তো থাকে না সবসময়। তাছাড়া এটা মাসের শেষ। এ সময়ে টানাটানি থাকে সকলেরই।

—তুমি বড্ড মিথ্যে কথা বলো। মোটেও টানাটানি থাকে না সকলের। তাহলে তুরির বাবা অত খরচ করে কি করে তুরির বার্থ ডে-তে ?

—তুরির বাবার ব্যবসা আছে, কারখানা আছে। বড়লোক। ওদের কথা বাদ দাও। আমরা মিডল ক্লাস পিপ্‌ল। আমাদের হাতে সব সময় অত টাকা থাকে না।

—থাকে না যদি, তুমিও তাহলে কারখানা করলে না কেন?

—ভুল হয়ে গেছে।

—তুরির বাবার কটা গাড়ি বল তো?

—অনেক।

—অনেক নয়, তিনটে। একটা কালো, একটা নীল। তুরিকে তার বাবা সাইকেল কিনে দিয়েছে কবে। যখন এতটুকু। তুরির বাবা রোজ বিদেশে যায়। জানো তো তুরি যা পরে তার একটাও আমাদের দেশের নয়। সব ওর বাবা বিদেশ থেকে কিনে আনে। তুরি কিন্তু একটু বড় হয়ে আর এদেশে পড়বে না। আমেরিকায় চলে যাবে। আমি বড় হয়ে কোথায় পড়বো?

—তোমার কোথায় ইচ্ছে বলো।

—তুরি যেখানে পড়বে।

—তার মানে আমেরিকায়? বেশ তো, আগে বড় হও।

—আমেরিকা খুব ভালো দেশ।

—কি করে জানলে?

—দেখছো না সকলেই আমেরিকায় চলে যাচ্ছে।

—কারা?

—তুরির দাদা থাকে আমেরিকায়। তুরির দিদির বিয়ে হয়ে আমেরিকায়। সেদিন গার্গি মাসীমা বলছিলেন আমেরিকায় যাবেন। গার্গি মাসীমা আমেরিকায় চলে গেলে মায়ের খুব বিপদ হবে।

—কেন?

—তুমি জানো না বুঝি!

—কি বল তো?

—মা না গার্গি মাসীমার কাছ থেকে টাকা ধার নেয়।

—তাই বুঝি! নিয়ে কি করে?

—জানো না, একবার আমার স্কুলের ফিস্ দেবার টাকা ছিল না মায়ের কাছে। মা দৌড়ে গেছল গার্গি মাসীমার কাছে। গার্গি মাসীমা বাড়িতে ছিল না। মা পাগলের মতো হয়ে গেছল তখন।

—তারপর?

—তারপর বুদ্ধি করে ধার নিয়েছিল রাখাল স্টোর্স থেকে। মাকে প্রত্যেক মাসে ধার করতে হয় কেন গো?

—তুমিই বল না, কেন?

—আমি জানি।

—কি?

—আমরা ঝুনুদের মতো পুওর। পুওর মানে জানো তো? গরীব।

—ঝুনু কে?

—ঝুনু আমার ক্লাস মেট। আমরা স্কুলবাসে যাই এক সঙ্গে। ঝুনুরা জানো তো, আমাদের চেয়েও পুওর। তুরির বার্থডে-তে ও আজ আসবে না। আমি ওকে কত করে বললুম, আয় না, খুব মজা হবে, ও বললো, না ভাই বাবা বারণ করেছে, বাবা কিচ্ছুটি কিনে দিতে পারবে না প্রেজেনটেশনের জন্যে, প্রেজেনটেশন না নিয়ে কি করে যাই বল, লজ্জা করবে। জানো তো, ঝুনুরা এত পুওর যে টিফিনে শুধু আলু সিদ্ধ আর রুটি নিয়ে যায়। আমি ওকে একেক দিন আমার কলা, মিষ্টি, ডিম খেতে দিই।

—বাঃ, ইউ আর এ গুড গার্ল।

—কেন গো, গুড গার্ল বললে কেন?

—তুমি তোমার বন্ধুকে ভালোবাসো বলে।

—ভালোবাসলে কি হয়?

—ভালোবাসা উচিত। ইট্‌স্‌ এ ডিউটি অফ ম্যান।

—তাহলে তোমরা আমাকে ভালোবাসো না কেন? তুরির মা কখনো তুরিকে বকে না। তোমরা তো আমাকে রোজ বকো।

—সে তুমি দুষ্টুমি করো বলে।

—তাহলে তুমিও দুষ্টুমি করো?

—আমি! আমি দুষ্টুমি করবো কার সঙ্গে?

—তাহলে মা তোমাকে বকে কেন?

—ওকে বকা বলে না। ওটা হল কথা কাটাকাটি।

—না, ওটাই বকা। মা তোমাকে খুব বকে। আমি জানি বকে। তারপর মা কাঁদে, মা কালও কেঁদেছে।

—রুমা! খুব বাচাল হয়ে উঠেছো তুমি। যাও, এখান থেকে। খুব খারাপ বদভ্যেস তৈরী হচ্ছে তোমার। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েও ম্যানার্স শিখলে না এখনো।

—মা কেন কাঁদে আমি জানি।

—কেন?

—তোমার উপর রাগ করে নয়। তোমাকে খুব ভালোবাসে বলে।

—এসব খবরও তোমার জানা হয়ে গেছে?

—মা আমাকে অনেক কথা বলে।

—কি বলে?

—মায়ের ইচ্ছে ছিল না আমাকে ইংলিশ মিডিয়মে পড়ানোর। তুমিই নাকি জেদ করেছিলে।

—ঠিকই বলেছে। এখন বুঝতে পারছি ঠিকই বলেছিল তোমার মা। তোমার মায়ের কথাটাই শোনা উচিত ছিল আমার। তুমি যা হয়ে উঠছো দিনকে দিন!

—আমাকে বকছো কেন? আমি তো আর বলিনি যে ইংলিশ স্কুলে পড়াও। তুমি কেন চাইলে, সে তুমি জানো।

—তুমি মানুষ হবে বলে।

—মানুষ তো হবো।

—কোনও দিনও মানুষ হবে না তুমি।

—কেন, হবো না কেন?

—হলে, তোমার বন্ধু ঝুনুর মতোই রিফিউজ করতে তুরির বার্থ ডে-তে যাওয়া। ঝুনু যেমন তোমাকে বলেছে, তুমিও তেমনি তুরিকে বলতে পারতে—না ভাই, বাবা বারণ করেছে, বাবা কিচ্ছুটি কিনে দিতে পারবে না প্রেজেনটেশনের জন্যে···

—বাঃ রে, ওরকম ভাবে বললে তো তুরি বুঝে যেতো যে আমরা ঝুনুদের মতো পুওর।

—ভাবলে ক্ষতি হতোটা কি?

—বাঃ রে, আমরা ঝুনুদের মতো পুওর নাকি? দিদা-র ক্যানসার হয়েছে বলে তোমরা টাকায় কুলোতে পারছো না। দিদা মরে গেলে আমরা আবার···

—রুমা, প্লিজ স্টপ···

লাগাতার স্ট্রাইকের সপ্তম দিন

মৃগেনবাবুর আপিসে হঠাৎ স্ট্রাইক। লাগাতার। মৃগেনবাবু সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক। সাহিত্যের সুপার-মার্কেটে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি। যতটা খ্যাতিমান হলে বা হয়েছেন ভেবে কোন কোন লেখক সিল্কের ঢলঢলে পাঞ্জাবিতে সব সময় সেজে থাকেন ভাবগম্ভীর সভাপতি অথবা প্রধান অতিথি, তিনি ততটাই খ্যাতিমান। খ্যাতিমান বলেই মৃগেনবাবুর দু-রকম পোশাক। বাড়িতে লুঙ্গি। কিন্তু আপিসে আগে যা বলা হল। খ্যাতিমান বলেই মৃগেনবাবুর দু-রকম কণ্ঠস্বর। বাড়িতে বাড়ির লাটসাহেবের মতো। তারাশঙ্করের 'জলসাঘর' যাত্রায় অভিনীত হলে বিশ্বম্ভর রায়ের চরিত্র যে-ভাবে অভিনীত হত, অনেকটা সেই রকম। কিন্তু আপিসে, সভাসমিতিতে, টিভি-রেডিয়োয়, সাহিত্য সম্মেলনে তাঁর বিনীত, বিগলিত, বিলম্বিত, চিবোনো অথচ পুরোটা চিবোনো নয়, যেন তাঁর প্রতিটি বাক্য বাদামের মতো খোসাসম্পন্ন তাই কথা বলতে হয় সেগুলোকে ভেঙে, এই রকম বিশুদ্ধ ও সহজসুলভ। খ্যাতিমান হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ নিজেকে খ্যাতিমান মনে হওয়ার পর থেকে মৃগেনবাবুর শরীরটাও দু-রকমের। বাড়িতে তিনি লাঠির মতো সোজা। কিন্তু আপিসে এবং অন্যত্র ছাতার বাঁটের মতো ঘাড় অথবা কোমর থেকে বাঁকানো। তিনি যখন নতমস্তকে চলা হাঁটা করেন, যথার্থ বুদ্ধিজীবীর বৈদুর্যপ্রভার বিচ্ছুরণ ঘটে যায় যেন। এমন কি ঐ রকম অবস্থায় তিনি যদি মনে মনে 'মাছওয়ালী মাগীটা পচা মাছ দিয়ে বেশ ঠকাল তো আজ' জাতীয় ভাবনায় নিমগ্ন থাকেন, পথচারীর অথবা কর্মচারীর অথবা সভাসমিতির ব্রতচারীদের মনে হবে স্পিনোজার দর্শন কিংবা

আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যে সুফিজমের প্রভাব জাতীয় কোন মহান ভাবনায় ধ্যানের মতো আচ্ছন্ন। মৃগেনবাবুর ব্যবহারও দুই প্রকার। কার্যসিদ্ধির প্রয়োজনে তিনি দীনাতি-দীন। অপরে তাঁর কল্কেয় তামাক খেতে চাইছে অনুমান করে নিতে পারলে, ফণা, বিষ ও ল্যাজের ঝাপটাসহ গোখ্‌রো।

আসলে মৃগেনবাবু মোট দুটি মানুষ, মূলত যদিও এক। দীর্ঘ অধ্যবসায়েই একমাত্র এটা সম্ভবপর। যখন কলেজের ছাত্র, তখন থেকেই তাঁর চরিত্রের এই দ্বিমুখী বিকাশ। মনে মনে নাৎসীরা যতখানি ইহুদীকে, কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে ততখানিই ছিল তাঁর ঘৃণা। কিন্তু তাদের সংগঠন-শক্তির দাপটে কখন কি ঘটে যায় এই আশঙ্কায় ছাত্র-ফেডারশনের বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয়ের সঙ্গে সুকৌশলে পাতিয়ে রেখেছিলেন এক-গলা বন্ধুত্ব। সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতিমান হওয়ার আগে, এবং সাংবাদিক হিসেবে কোঁচড়-ভর্তি মাইনে পাওয়ার রেওয়াজ শুরুর পূর্ব যুগে মৃগেনবাবু আর্থিক সমস্যার সুরাহায় বেছে নিয়েছিলেন অনুবাদের কাজ। যেহেতু তখনো 'নন অ্যালায়েণ্ট' নীতি নির্ধারিত হয়নি এবং পণ্ডিত নেহেরু রুশ না আমেরিকা কোন ব্লকে ঝুঁকবেন তা ছিল প্রতিদিনের জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা, স্টেইনবেক শেষ করেই মৃগেনবাবুর হাত তুর্গেনিভে।

নিজের আপিসে লাগাতার স্ট্রাইকের খবর পান তিনি মাঝরাতে। টেলিফোনে। টেলিফোনে লাগাতার স্ট্রাইকের খবর পাওয়া মাত্রই তিনি কাগজের মালিক ও সম্পাদক দীপ্তেন্দু মজুমদারকে তাঁর বাড়িতে ফোন করার চেষ্টা করেন। ফোনে কিভাবে তিনি স্ট্রাইকের বিরুদ্ধে এবং ম্যানেজমেণ্টের পক্ষে সমর্থন জানাবেন, তার একটা দ্রুত-খসড়াও ছকে নিয়েছিলেন মনে মনে। মৃগেনবাবু এক সময় তাঁর কাগজের তিন নম্বর সম্পাদকীয়টি লিখতেন বেশ কয়েক বছর যাবৎ। কলের জলে সাপ, কেরোসিনের

আকাল, নিউজ প্রিণ্টের মূল্যবৃদ্ধি, হাজারিবাগের পাগলা হাতি, জন্ম নিয়ন্ত্রণের ত্রিভুজ, শৌলমারীর সাধু কেন নেতাজী নয়, মহাকাশে মানব, রিকশার উপদ্রব, চিড়িয়াখানায় শীতের অতিথি পাখি, মাধ্যমিকের ফলাফল ইত্যাদি বিষয়ে ঝটিতি বেগে আধ কলম লেখায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন যথেষ্ট কৃতিত্ব সহকারে। কার্লাইল শেকস্‌পীয়র, শেলী, কীটস, সোফোক্লিসের কোটেশন ব্যবহারের রেসিপি ছিল তাঁর করায়ত্ত। তা ছাড়া কলেজ জীবনে ডিবেটে ছিল তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা। ফলে যে কোন বিষয়ের পক্ষে অথবা বিপক্ষে যুক্তি-সংযোজনে তিনি ছাত্রাবস্থা থেকেই সক্ষম। টেলিফোনে মালিক ও সম্পাদককে না পেয়ে কাগজের অন্যান্য উচ্চপদস্থদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রায় আড়াই তিন ঘণ্টার একনিষ্ঠ চেষ্টাতেও তিনি ব্যর্থ হন পুরোপুরি। এবং অনুমান করে নিতে পারেন, সমস্ত ফোনেরই রিসিভার নামানো।

ঘুম মৃগেনবাবুর উদ্যমের উপর ক্রমাগত ছোবল মারায় টেলিফোনের টেবিল থেকে উঠে তিনি নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েন অচিরাৎ। ঘুমিয়ে পড়ার পক্ষে তাঁকে ক্যামপোজ-এর মতো সাহায্য করেছিল অকাট্য একটি যুক্তি। এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান কি আর পারবে না সামান্য দুশো-চারশো অধস্তন কর্মচারীর লাগাতার স্ট্রাইক ভাঙার গোপন সাবমেরিন বানিয়ে নিতে? সিদ্ধান্তের এই সবলতা অথবা সিদ্ধান্তের প্রতি কংক্রীটে-গাঁথা আস্থাই তাঁকে পাড়িয়ে দেয় নিরুদ্বিগ্ন নিরাপত্তার ঘুম।

॥ প্রথম দিন ॥

যথারীতি নটার মধ্যে এসে যায় রমেশ। মৃগেনবাবুর ড্রাইভার। রমেশ গ্যারেজের চাবি চাইতে ওপরে উঠে আসে। অন্যদিন এ-রকম সময়ে মৃগেনবাবুর দাড়ি কামানো স্নান ইত্যাদি

হয়ে যায়। রমেশ এলে খেতে বসেন। রমেশ গাড়ি ধোয় মোছে। মৃগেনবাবুর খাওয়া হয়ে যায়। সাহেবের চেহারায় ছুটির গন্ধ পেয়ে রমেশ একটু ঘাবড়ে যায়। সে চাবি চাইবে কিনা বুঝতে পারে না। রমেশের সামনেই মৃগেনবাবু সিগারেটটা শেষ করেন। ভরাট অ্যাসট্রের মধ্যে সিগারেটের উদ্বৃত্ত অংশটুকুকে দুমড়ে-মুচড়ে ঢুকিয়ে তিনি রমেশের দিকে তাকান।

—তুমি তো এসে গেছ। আমাদের আপিসের খবর শোন নি তার মানে।

—আজ্ঞে না, কি হয়েছে?

—লাগাতার স্ট্রাইক ডেকেছে এক নম্বর ইউনিয়ন।

কথাটা শেষ হতেই তলপেটের নিচের অংশ কুটকুট। লুঙ্গির উপর থেকেই চুলকোতে থাকেন তিনি।

বনশ্রী সামনে এসে দাঁড়ান। স্ত্রী। চুলকোনো থামে না।

—ওকে দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন? যা হোক একটা বলবে তো।

—রমেশ!

—আজ্ঞে…

—কি করবো বলতো…

রমেশ হাত কচলায়। সাহেবের মেজাজ-মর্জির টাইমটেবল্ তার মুখস্থ। ছুতো পেয়েছেন, গাড়িটা না বেরোলেই সাহেবের খুশি। তেল বাঁচবে। কোম্পানীর গাড়ি। তার উপরে তেল মানে পেট্রোল আর মেনটেনান্স বাবদ পাঁচশো। বাকি অতিরিক্ত খরচা নিজের। সেইটুকু বাঁচানোর জন্যে সাহেবের অষ্টপ্রহর হিসেব-নিকেশ।

—তাহলে আজ না হয় নাই বেরোলেন…

রমেশের শরীরে বাঁক নেওয়ার একটা ঝোঁক ফুটে ওঠার মুহূর্তেই বনশ্রীর গলা।

—তুমি বেরোবে না তো ডুমুর যাবে কি করে ?

—ডুমুর কোথায় যাবে ? ওর তো কলেজ ছুটি।

—বাঃ তোমাকে চারদিন আগে বলে রেখেছে লেক গার্ডেনসে ওর এক বন্ধুর বার্থডে···।

মৃগেনবাবুর খেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে। কিংবা খিস্তির মতো কোনো খোঁচা মারা। বাপের পেট্রল পুড়িয়ে মেয়ের ফষ্টি-নষ্টি। তাঁর আধা পিউরিটান স্বভাবে গ্যাসটাইট্রিসের মতো জ্বালা। কিন্তু বনশ্রী শুনতে পান তাঁর অতিশয় সৌজন্য পারিপাট্য কণ্ঠস্বর।

—তাহলে ওকে চাবিটা দিয়ে দাও গ্যারাজের।

রমেশ চাবি নিয়ে নামবার সময় বলে—গোবিন্দ তো ডিউটিতে গেল।

—গোবিন্দ ? ডিউটিতে গেল ?

নিজের গালে চড় মারতে ইচ্ছা করে মৃগেনবাবুর। কী আশ্চর্য, অনিমেষের কথা একবারও মনে পড়ল না সকাল থেকে ? গোবিন্দ অনিমেষের ড্রাইভার। রমেশ আর গোবিন্দ দুজনেই থাকে এক জায়গায়। সোদপুরে। রমেশ গোবিন্দর নামটা না করলে অনিমেষকে হয়তো সারা দিনেও মনে পড়ত না আমার !

অনিমেষ তাঁর সেরা দোস্ত। দুই বন্ধু, সেই কলেজ লাইফ থেকে বন্ধুত্ব। একসঙ্গে জয়েন করেছিলেন খবরের কাগজের চাকরিতে। তিনমাস পরে দুজনেরই রিটায়ার্ড হওয়ার কথা। একস্‌টেনশন পাওয়ার ব্যাপারে দুজনেই অনিশ্চিত। কিভাবে একস্‌টেনশনটা বাগানো যায় সে-সলাপরামর্শে মৃগেনবাবু অনিমেষের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। স্ট্রাইকের ব্যাপারে অনিমেষ কি ভাবছে সেটা জানার জন্যে আরেক রকম চুলকোনি ছড়িয়ে পড়ল তাঁর মনে।

অনিমেষের বদলে ফোন ধরল টুলি।

—বাবা তো ঘণ্টাখানেক আগে বেরিয়ে গেছেন।

—কোথায় গেছে জানো নাকি?

—না, একটা ফোন এল, বাবা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন খেয়ে দেয়ে।

মৃগেনবাবুর শরীরে তৎক্ষণাৎ ভূমিকম্প। যথেষ্ট বাঁদরামি করেছি আমি। নিশ্চয় ওকে ম্যানেজমেণ্টের কেউ ফোন করেছিল। নইলে এত তড়িঘড়ি বেরোবে কেন। স্ট্রাইকের সুবাদে ম্যানেজমেণ্টের কারো সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার তালে আছে অথবা তাল খুঁজছে নিশ্চয়ই। খবরের কাগজের পলিটিকস্, আসল পলিটিকসের ঠাকুর্দা। পলকে পলকে তার রঙ বদল। সে যাই হোক, ম্যানেজমেণ্টের লোহার বাসরে ও কোন্ ফাঁক দিয়ে ঢুকতে চাইছে, সেটার হদিস নেওয়াটা এখন এমার্জেন্সীর মতো জরুরী।

ডুমুরকে রেডি হতে বলে আর একটা চারমিনার ধরিয়ে মৃগেনবাবু বাথরুমে ঢুকলেন। তাঁর স্নান খাওয়া, রেডি হওয়া, গাড়ি চাপা ইত্যাদি ঘটে যায় অ্যানিমেশন ফিল্মের মতো ঝট্‌কা বেগে। গাড়ি মিশন রো আর সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের ক্রসিংয়ে পেঁছিলে তিনি ড্রাইভারকে নির্দেশ দেন বাঁ দিকে না বেঁকে সোজা এগোতে।

—শোনো, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট ধরে চলো। আমি কফি-হাউসে যাবো। তুমি আমাকে ভিকটোরিয়া হাউসের কাছে নামিয়ে দেবে।

গাড়ি থেকে নামবার মুখে ডুমুরকে

—ডুমুর, এখানে কি পরিস্থিতি জানি না। গাড়িটার দরকারও হতে পারে হয়তো। তুমি নেমেই ছেড়ে দিও ওকে। তোমার বন্ধুরা কেউ পেঁছে দিতে পারবে?

—ফেরার সময় আমার কোনো অসুবিধে হবে না, বাবা। তুমি যাও। ওদের তিনটে গাড়ি।

গাড়ি চলে যায়। অনিমেষকে পাকড়ানোর জন্যে তাঁর ভিতরে হাজার হর্সপাওয়ারের টেনসান। কিন্তু নিজেকে সংহত করেন তিনি। একটু দাঁড়িয়ে কয়েকটা জরুরী হিসেব সেরে নিতে হয় তাঁকে। স্ট্রাইকের ব্যাপারে কোন্ পক্ষের কি মনোভাব তিনি জানেন না। এমনও তো হতে পারে জার্নালিস্ট গ্রুপের গোপন সমর্থন রয়েছে স্ট্রাইকে। আর কফি-হাউস, না ঢুকেও তিনি বুঝতে পারেন, এখন তাঁদের কাগজের সাংবাদিক শ্রেণীর সমাবেশে গম্‌গম্। ষোলো বছর আগে আরো একবার এই কফি হাউস হয়ে উঠেছিল স্ট্রাইক-বিরোধীদের শিবির।

তাহলে আমার মুখের অভিব্যক্তিটা কেমন হবে? ক্রুদ্ধ, বিরক্ত অথবা অ্যাজিটেটেড মনে হলে কেউ কেউ ভাববে আমি ম্যানেজ-মেণ্টের পক্ষে। স্ট্রাইক-সমর্থকরা খচবে। বিষণ্ণ, বিপদাপন্ন হলেও তাই। আমার মুখশ্রী প্রশান্ত এবং উদ্বেগহীন হলে ম্যানেজমেণ্ট পক্ষের চামচেরা রটিয়ে দেবে আমি স্ট্রাইকের সমর্থক হয়তো বা। এখানে 'রাষ্ট্রপতির শাসন কি গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের পক্ষে অপরিহার্য?' এই রকম কোনো সেমিনারের অন্যতম বক্তার মতো থট্‌ফুল একস্‌প্রেশনটাই হবে ঠিকমতো মানানসই।

সেই রকম মুখোশ পরেই মৃগেনবাবু কফি হাউসে ঢোকেন। সিগারেটের ধোঁয়ায় হাউসের ভিতরে তখন শীতের কুয়াশা। কুয়াশাটাকে ভারী করে তুলেছে প্রত্যেক টেবিলের টগবগে কথা-তর্ক-চিৎকার মিলিয়ে অবয়বহীন একটা শব্দরোল। সে শব্দরোল যেন ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে চায় মৃগেনবাবুকে। মৃগেনবাবুও বুঝতে পারেন না এই কুয়াশা ও শব্দরোল ঠেলে কোথায় তাঁর পৌঁছনোর জায়গা। শুরু-হয়ে-যাওয়া সিনেমা-থিয়েটারে ঢুকলেও এই রকম দিশেহারা লাগে। সেই নিরেট অন্ধকারকে চোখে সইয়ে নেওয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কিছুক্ষণ। মৃগেনবাবুও দাঁড়িয়ে থাকেন।

ক্রমে আঁধার সরতে থাকে। জাগে অনুধাবনযোগ্য চরাচর। প্রথম দফায় তাঁর মনে হয়েছিল সবই অপরিচিত বা অল্প-পরিচিতের ভিড়। একটু পরে চেনা পরিচিত অজস্র মুখ চোখে পড়ে চতুর্দিকে। কেউ কেউ তাঁকে চেঁচিয়ে উত্তেজনাময় ডাকও দেয়। মৃগেন হাত তুলে রেসপন্স জানান। কিন্তু এগোন না। এক পলকের জন্যে মনে হয় যেন তিনি গ্রহণ করছেন গার্ড অফ অনার। ধীরে তাঁর উত্তোলিত বাহুটি নামান। আর তখনই তিনি শুনতে পান চেনা গলার ডাক। সে ডাকের উৎসের দিকে তিনি এগোতে থাকেন এঁকে বেঁকে, প্রায় হাঁটার অযোগ্য চেয়ারের ভিড় ঠেলে। একটা হাউসে তিনটে হাউসের লোক।

থামেন একেবারে শেষের দিকের কোণে। গোলাকার আড্ডা। মৃগেনবাবুকে বসবার জন্যে অতিরিক্ত জায়গা বের করে দিতে প্রত্যেকে নিজের চেয়ার সরিয়ে নাড়িয়ে পিছিয়ে নেয়। জায়গা বেরোয়। কিন্তু বারংবারের অনুরোধ সত্ত্বেও কোন চেয়ার এসে পৌঁছয় না। ম্যানেজার জানান, আর চেয়ার দেওয়া অসম্ভব। অগত্যা সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভাগাভাগি করে এক চেয়ারে বসতে বাধ্য হন তিনি। সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় হাল-আমলের একজন উল্কাসদৃশলেখক। শীতের মরশুমের ফুলকপির মতো তাঁর লেখার চাহিদা। মৃগেনবাবুর গ্রুপ ন্যাসটি এবং অবুনকৃশাস বলে যতই ভুরু কুঁচকোক্, কোম্পানীর কাছে তার জামাই-আদর। মানসিক অস্বস্তি সত্ত্বেও তাঁকে সন্দীপের গায়ে গা ঠেকিয়ে বসতে হয়। কারণ সেইই প্রথম আগ্রহ সহকারে আহ্বান জানিয়েছে। নিজের দীর্ঘ শরীরের ভারসাম্য রক্ষার খাতিরে তাঁকে হাত রাখতে হয় সন্দীপের পিঠে। না, অনিমেষ নেই এখানে। যদিও এ আড্ডাটা সহকর্মী সাহিত্যিকদের। অনিমেষ তাহলে কোন্ বৈঠকে, কোথায়?

আধঘণ্টায় আড্ডায় তাঁর জানা হয়ে যায় এক নম্বর ইউনিয়নের

হঠাৎ লাগাতার স্ট্রাইক ডাকার কার্যকারণ। আরো আধঘণ্টার আড্ডায় তিনি জানতে পারেন আজ সকাল থেকে মালিক পক্ষ নিখোঁজ। কমকর্তারা কেউ টেলিফোনে তাঁদের ধরতে পারছেন না। দেড় ঘণ্টার মাথায় তিনি টের পেয়ে যান সাংবাদিকরা, বিশেষ করে যারা বয়সে তরুণ, স্ট্রাইকের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। অপরদিকে মালিকপক্ষের সঙ্গে কমিউনিকেশন গ্যাপ নিয়েও তারা সমপরিমাণ উত্তেজিত। দু ঘণ্টার মাথায় কফি হাউসে ছড়িয়ে পড়ে এক মারাত্মক স্কুপ। মালিক পক্ষই নাকি ছক্ সাজিয়েছিল এমনভাবে যাতে স্ট্রাইক হয়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী। এই সময় একটা লম্বা স্ট্রাইক চললে নাকি একটা মোটা অঙ্কের ব্যাঙ্ক-পেমেণ্টের সুরাহা হয়। এইভাবে, ক্রাইম-থ্রিলার যেন, যেন দৃশ্যে দৃশ্যে রক্ত-কাঁপানো সাসপেন্স, প্রতি আধঘণ্টায় নানা ঘোড়ার মুখ থেকে নানান টাটকা খবরে কফি হাউসের ভিতরটা পুজোর ছুটির সেকেণ্ড ক্লাস কমপার্টমেণ্ট।

স্ট্রাইক মিটে যাবে দু-চার দিনের মধ্যেই। মুখ্যমন্ত্রী রাজী হয়েছেন ইনটারভেনশনে। স্ট্রাইক চলছে, চলবে। ডেলি পেপার বন্ধ রেখে মালিক পক্ষ অন্যসব কিছু বের করবেন মাদ্রাজ থেকে। অলরেডি ম্যানেজমেণ্টের টপ্‌রা পাড়ি দিয়েছেন বোম্বেয়। সেইখানে তৈরী হবে ভবিষ্যৎ অ্যাকশনের ব্লু-প্রিণ্ট। মুখ্যমন্ত্রী যাই বলুন, পার্টি তাদের ডিশিসানে ফার্ম। কাল থেকে ওরা নামছে আন্দোলনকে মদত দিতে। রাজ্যপাল দিল্লীকে নোট পাঠিয়েছেন আজ সকালে। পরশুই হয়তো প্রেসিডেণ্টস রুল। ম্যানেজমেণ্ট আজ রাত্রে গোপন বৈঠকে বসছে কলকাতারই কোন এক জায়গায়। ম্যানেজমেণ্ট আমাদের সামনে আসছে না কেন? আমরা কি রাস্তার ভিখিরি? আনসার্টেন পিরিয়ড পর্যন্ত স্ট্রাইক চললে আমাদের মাইনে দেবে কে? হোয়াই সুড উই সাফার? লক্-আউট, লক্-আউট, কোম্পানী লক-আউটের কথা ভাবছে। এ স্ট্রাইক, আমি

লিখে দিচ্ছি তিন মাসের আগে মিটবে না। প্রেসিডেণ্ট জানতে চেয়েছেন স্ট্রাইকের ডিটেল। এটা আজ দুপুরের রেডিও নিউজ।

ঘড়ির কাঁটায় যখন সাড়ে ছটা মৃগেনবাবু পারমাণবিক চুল্লীর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন। গাড়িতে ওঠার মুখে রমেশ বলে—তেল নিতে হবে কিন্তু।

—তেল? কেন তেল নেই? সব শেষ করে এলে?

—লেক গার্ডেনসেই তো ঘুরেছি আধঘণ্টা। দিদিমণি বাড়ি চিনতে পারেননি।

—যেমন তোমার দিদিমণি, তেমনি তুমি। কাল থেকে আর গাড়ি বের করতে হবে না। তোমার ছুটি। বুঝেছ। আমি খবর পাঠালে আসবে।

মৃগেনবাবুর দপ্ করে জ্বলে ওঠার পিছনের কারণটা শুধু পেট্রলের খরচা নয়। কফি হাউসে আড্ডা দিতে বসে তাঁকে পার্স খুলতে হয়েছে তিনবার। গাঁটগচ্চা গেছে গোটা বাইশেক টাকা। মৃগেনবাবু অমিতব্যয়ে অনভ্যস্ত। তিরিক্ষি হতে বাধ্য।

॥ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিন ॥

হুকুম অনুযায়ী রমেশ পরের দিন থেকে অনুপস্থিত। মৃগেনবাবুও আপিস বেরনো না-বেরনো সম্পর্কে আপাদমস্তক উদ্বেগহীন। এ-কদিন নিজের বিবেককে তিনি যে-জাতীয় যুক্তি পরম্পরায় গড়ে-পিটে নিয়েছিলেন তা এই রকম—

কফি-হাউসের একদিনের আড্ডায় বুঝে গেছি, এ স্ট্রাইক মেটার নয় এখুনি। বিয়ে-বাড়ির ছ্যাঁচড়া। এক আঁচে চৌষট্টি রকম আনাজ-পাতি। তাছাড়া মালিকপক্ষই যখন আণ্ডার গ্রাউণ্ডে, তখন নিয়মিত হাজিরা উদ্দেশ্যহীন ও অবান্তর। আবার রোজ হাজিরা মানে তো পেট্রল প্লাস খাওয়ার টেবিলের গাঁটগচ্চা মিলিয়ে

ডেলি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। কোম্পানীই যদি লাটে ওঠে, পেট্রলের খরচ যোগাবো কি গাঁটের কড়ি ঢেলে? এসব কথা বাদ দিয়েও যদি ভাবি, এ-স্ট্রাইক আমার কাছে তেমন কোন সাংঘাতিক সর্বনাশ নয়। রিটায়ার্ড হতে আর তিন মাস। ম্যানেজমেন্টের যতটা গুড বুকে থাকলে একস্‌টেনশন মেলে, দৈবক্রমে তা নই। যতই ছেনালীপনা করি, মূলত আমি একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক। আমার মান-সম্মানবোধ প্রখর। আমাকে কেউ ফ্যালনা ভাবুক, বরদাস্তে নারাজ। সাপ্তাহিক 'ভাবনা'-র সম্পাদক রিটায়ার্ড করলে সে চেয়ারে বসানো হবে আমাকে, উপরমহলের ফিসফাস থেকেই সারা আপিসে ছড়িয়ে পড়েছিল খবরটা। কিন্তু সেখানে বসানো হল আমার চেয়ে জুনিয়রকে। অপমানের আগুনে পুড়ে পুড়ে কালো হয়েছি রোজ। কাঠ-বাঙাল। প্রতিশোধ-স্পৃহা আমার নাড়ীতে নাড়ীতে পদ্মা-মেঘনার মতো ফুঁসতে থাকে ঐ সময়। এরই কিছুদিন পরে কানে আসে 'প্রাত্যহিক' পত্রিকাগোষ্ঠী পরিকল্পনা করছে একটা সাপ্তাহিকের। কোম্পানীর সঙ্গে আমার ব্যাড-রিলেশনের খবরটা তাঁদের কানে পেঁছে দিই কৌশলে। ডাক আসে সেখানে। যোগাযোগ চলে গোপনে। কিন্তু এসব খবর গোপন রাখা মুশকিল। জানাজানিও হয়ে যায় গোপনে। সাপ্তাহিক-এর পরিকল্পনা অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে বন্ধ হয়ে যায় হঠাৎ। আমি ম্যানেজমেন্টের বিষনজরে পড়ি। আমাকে টাইট দেওয়া শুরু হয়। গত বছরই প্রথম শারদীয়ায় উপন্যাস চাওয়া হল না আমার। এক কোপে ছ হাজার টাকা নির্মূল। আমাকে রিভিউ লিখতে দেওয়া হয়। ছেপে বেরোলে দেখি, আসল আসল জায়গায়, যেখানেই একটু আধটু হুলের দাগ, কেটে ফাঁক। আগে কোম্পানীর যে-কোন পার্টিতে নিমন্ত্রণ-পত্র পেঁছত টেবিলে। আজকাল ঝাড়াই-বাছাই সেখানেও। অর্থাৎ ঠারে-ঠোরে প্রতিদিনই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমি এখন বাতিলের খাতায়। অতএব

একস্‌টেনশন দুরাশা। অনিমেষ জাল ফেলছে। ফেলুক। তাতেই বা কি হবে? বড় জোর একবছর। যে-কাগজে আমি নিতান্তই পরগাছা, নাড়ীর টান গেছে ছিঁড়ে, সে-কাগজ মরল কি বাঁচল, ডুবল কি ভাসল আমার হেডেক থাকার কথা নয়। লেট ইট্‌ ডাই ইটস্‌ নর্মাল ডেথ্‌।

লাগাতার স্ট্রাইকের ছদিনের রাত্রি পর্যন্ত মৃগেনবাবু এইভাবে নিজের সজ্ঞান চেতনার গায়ে এঁটে রেখেছিলেন সবল যুক্তির বর্ম, সাতদিনের সকাল থেকে সে-বর্মে উপর্যুপরি অস্ত্রাঘাত।

॥ **সপ্তম দিন** ॥

সকালে বিছানায় আধশোওয়া ভঙ্গিতে, গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে না দিতেই দমকলের ঘণ্টার মতো টেলিফোনের ঝন্‌ঝনানি। তুলতেই অনিমেষের গলা।

—অনিমেষ? কোথায় ছিলি তুই?

—আমি? আরে আমি তো বারো তারিখ থেকে জলপাই-গুড়িতে। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি। স্ট্রাইকের খবর তো পেলাম ওখানেই। পরশু ফিরেছি। ইতিমধ্যে জল অনেকদূর গড়িয়েছে। শোন্‌, খুব জরুরী দরকার আছে। তোকে আজ বেরতে হবে। ঠিকানা বলে দিচ্ছি। আমরা ওখানে মিট করছি এগারোটার সময়।

—আমরা মানে কারা?

—আমরা মানে আমরা। তুই, আমি, সুধীর, পঙ্কজ, হরিসাধন, তরুণ এই রকম সব। মোটামুটি ধরে নে অ্যান্টি-ম্যানেজমেণ্ট যারা। আমরা একটা কমিটি করেছি। ইউনাইটেড ফ্রণ্ট। এই ফ্রন্টই এখন নেতৃত্ব দেবে। আন্দোলনের। সঙ্গে থাকছে নন্‌-স্ট্রাইকাররা।

—আন্দোলনটা কার বিরুদ্ধে বা পক্ষে ?

—এসব কথা টেলিফোনে বোঝানো মুশকিল। আমাদের আন্দোলনটা অ্যাপারেণ্টলি মনে হবে দুমুখো। আমরা যেহেতু স্ট্রাইকারদের বিরুদ্ধে গড়ে তুলবো জনমত। আবার সেই সঙ্গে এক্সপোজ করবো এই স্ট্রাইকের পিছনের রাজনৈতিক সমর্থন। প্রমাণ করে দেবো স্ট্রাইকটা একটা পলিটিক্যাল গেম। এর সঙ্গে স্ট্রাইকারদের দাবী-দাওয়ার সম্পর্কটা বাইরে থেকে চাপানো। এট্‌সেটরা, এট্‌সেটরা। আসলে আমাদের আন্দোলনটা ত্রিমুখী। আমাদের আসল লড়াই ম্যানেজমেণ্টের বিরুদ্ধে। ফ্রণ্টের নেতৃত্বে স্ট্রাইকটাকে ভাঙতে পারলে, ম্যানেজমেণ্টকে আমরাই ডিকটেট করবো টার্মস। যে-ম্যানেজমেণ্ট তোকে আর ঔপন্যাসিক মনে করে না, আমাকে লিখতে দেয়নি তিন বছর, শশাঙ্ককে দেয়নি পাওনা ইনক্রিমেণ্ট, সুধীরকে সাজিয়ে রেখেছে ঢপের ঠাকুর, পঙ্কজকে 'প্রাত্যহিক' থেকে সরিয়ে এনে ইনভ্যালিড করে রেখেছে আড়াই বছর, হরিসাধনকে এখনো পর্যন্ত কোনো ডেজিগনেশন দিল না, অথচ হঠাৎ হঠাৎ প্রেম চাগড়া দিয়ে উঠলে একে পাঠাচ্ছে লণ্ডন, তাকে আমেরিকা, ওকে জাপান, ইয়েসম্যানদের ঝপাঝপ্ গাড়ি, সেকেল বাবুদের রাঁড় পোষা আর কি···বুঝতে পারছিস ?

—পার্টলি, তুই যা বলছিস তা যদি সত্যি হয়, তো তোদের, বা ধর আমাদের, এই আন্দোলনের গোপন মোটিভেশন ম্যানেজমেণ্ট আঁচ করতে পারবে না ?

—ম্যানজমেণ্টের ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। তারা গা ঢাকা দিয়ে থাকার ফলে সকলের মনে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে, নিশ্চয় লক্-আউট বা অন্য কিছু করার মতলব আঁটছে তলায় তলায়। স্ট্রাইকারদের সঙ্গে কোনো ভাবেই আলোচনায় বসতে রাজী নয়, সে কথাটাও বাজারে ছড়িয়েছে বেশ। তার মানে ম্যানেজমেণ্ট চায় না ইমিডিয়েট কোনো সলিউশন। সেটাই হয়েছে আমাদের পক্ষে জোট

বাঁধার মোক্ষম সুবিধে। স্ট্রাইকার বাদে বাকী সব বয়সের কর্মচারীই এখন জমায়েত হতে চাইছে ফ্রণ্টের নেতৃত্বে। এ সুযোগ কখনো ছাড়া যায় না, ছাড়বোও না।

—কিন্তু আমি তো ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি।

—ট্যাক্সি করে চলে আয়। ফেরার সময় গাড়ির ব্যবস্থা করা যাবে। ও, তোকে আরও একটা কথা বলা হয়নি। আজ বিকেল থেকে কলকাতার নানা জায়গায় আমরা মিছিল এবং মিটিং অর্গানাইজ করছি, স্ট্রাইকের বিরুদ্ধে। আমরা জনগণকে জানাব—মূলত এই স্ট্রাইক এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের স্বার্থপ্রণোদিত। তোকে বলতে হবে।

—মিটিং-এ, মানে পাবলিক মিটিং-এ ?

—অবভিয়াসলি।

—সে কিরে ? পাবলিক মিটিং-এ কি বলবো আমি ? তা ছাড়া রাজনীতি-টাজনীতির ব্যাপারে আমি কিন্তু, সিরিয়াসলি—

—ইয়ার্কি রাখ। আমিও কি প্রফেশনাল পলিটিক্যাল অ্যাজিটেটর নাকি ? জুলিয়াস সীজারে অ্যাণ্টনীও বক্তা ছিল না। ঘটনার চাপ তাকে ওরেটর বানিয়ে ছাড়ল। তাই না ?

টেলিফোন নামিয়ে রেখে মৃগেনবাবু দ্রুত একটা চারমিনার ধরান। আঠারো বছরের যুবকের মতো লাফিয়ে নামেন বিছানা থেকে। খেয়াল ছিল না, লুঙ্গির গিঁটটা খোলা। খাট থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উলঙ্গ। পুরনো খোলসের মতো লুঙ্গিটা খসে পড়ে পায়ের তলায়। ভাগ্যিস তখন ঘরে কেউ ছিল না। থাকার কথাও নয়। বনশ্রী বাথরুমে। ছেলেমেয়েরা ঘুমন্ত। হাজার হর্সপাওয়ারের টেনশন তাঁকে দাঁড়াতে দেয় না। উলঙ্গ তাঁকে কেউ যেন ড্রেসিং টেবিলের আয়না পর্যন্ত টেনে আনে। বুক থেকে পা পর্যন্ত নিজের লোমশ চেহারায় তিনি প্রত্যক্ষ করেন বৃহৎ

সম্ভাবনাময় এক সাহসী পুরুষকে। নগ্ন অবয়বের দিকে তাকিয়ে তিনি মনে মনে উচ্চারণ করেন

—আমাকে তেজস্বী হতে হবে। অকুতোভয়। আনডণ্টেড।

আয়নার প্রতিফলিত মহামানবের মতো বিশাল মানুষটির পদধূলি নেওয়ার জন্যে মৃগেনবাবু নিজেকে দুখানা করে ভাঙেন। না, পদধূলি নয়, পায়ের তলা থেকে লুঙ্গিটাকে টেনে তোলেন তিনি। গিঁট বাঁধেন কোমরে। বিছানা থেকে বাঁ হাতের মুঠোয় খামচে তুলে নেন সিগারেটের প্যাকেট এবং দেশলাই। সঙ্গে সঙ্গে হাজার পাওয়ারের টেনশন তাঁকে ঠেলে নিয়ে যায় ছাদের দিকে। ছাদের উপরে মহাকাশ। নিচে ডাইনে বাঁয়ে দূরে অদূরে ছড়ানো অট্টালিকামালার কলকাতা। ছাদটাকে একটা বৃহৎ মঞ্চের মতো মনে হয় তাঁর। আরও মনে হয়, যেন সমস্ত অট্টালিকার মুখ এই ছাদের দিকে। প্রত্যেকটি অট্টালিকার মুখে উৎকন্ঠ প্রতীক্ষা। রাজনৈতিক অপশাসনে তাদের প্রত্যেকের মুখে ক্ষয়চিহ্ন, ক্ষতচিহ্ন। তাদের বিকাশ ব্যাহত। তাদের চোয়ালে চাপা প্রতিবাদ। তারা মিথ্যায় জর্জর। তারা সত্যের, ন্যায়ের, মহৎ আদর্শের দীক্ষা চায়। কিন্তু দীক্ষাদাতার অভাবে তাদের মুখমণ্ডল পাংশু, রক্ত হরিদ্রাভ।

—প্রিয় বন্ধুগণ···

না, এটা মামুলি। মেটে মেটে। নৈর্ব্যক্তিক। আমার প্রথম জনসভার বক্তৃতা হবে মহাভারতের গীতার মতো এক মহা-উদ্ঘাটন।

—সংগ্রামী বন্ধুগণ ও সহযোদ্ধা শ্রোতাবৃন্দ···

জনসভা, পথসভা, মিছিল। কদমে আমাদের জয়যাত্রা। স্বপ্ন সম্ভব হলে কমপক্ষে সাত বছরের একটেনশন। আবার ছ হাজারের উপন্যাস। গাড়ি টেলিফোন তো আছেই। আরও কিছু চাই। চাই কর্তৃত্ব। চাই অপমানের পাল্টা প্রতিশোধ।

—আমি মার্কসবাদী নই। কিন্তু মার্কসবাদ আমার অল্পস্বল্প পড়া আছে। ছাত্রজীবনে। ছাত্রজীবনে আমি ছিলাম বামপন্থী আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ কর্মী…

হ্যাঁ, কলকাতা শুনেছে। ক্রমশ চঞ্চল হয়ে উঠছে কলকাতা। খুলে যাচ্ছে কলকাতার বন্ধ দরজা-জানলা। কাতারে কাতারে মানুষ বেরিয়ে আসছে পথে। দীক্ষামন্ত্রের এক একটি শব্দে চমকে উঠছে তারা, মন্ত্রের ভিতরকার মঙ্গলদীপের আলো অগ্নি-রেখায় প্রতিটি মুখে এঁকে চলেছে নবজন্মের আকুতি কিংবা আততি। আজ আমারও নবজন্ম। পুনর্জন্ম। সাতবছর আগে কোনো লিটেরারি সাপ্লিমেণ্ট বেরোলে আমিই হতাম তার সর্বাধিনায়ক। সাতবছর পরে আবার ফিরে পাবো, ছিনিয়ে নেবো সেই কর্তৃত্বময় দাপট। আমি ফ্যালনা হওয়ার জন্যে জন্মাইনি।

—কিন্তু যে মার্কসবাদ সংবাদপত্রের, সাংবাদিকের স্বাধীনতার উপর হাঁকাতে চায় বুলডোজার…

কোটী কোটী হাতের করতালি ধ্বনি কানে আসে মৃগেন-বাবুর

নিজের প্রতিভার এই অভূতপূর্ব উন্মোচনে অভিভূত হয়ে পড়েন তিনি। অথচ এখন তো মাত্র রিহার্সাল। মানসিক খসড়া। এতদিন কলকাতা জেনেছে আমি শুধুই একজন সাহিত্যিক। আজ জানবে আমি একজন দক্ষ, বিচক্ষণ ·

যাত্রার নায়কের মতো মঞ্চের অর্থাৎ ছাদের চতুর্দিক ঘুরে ঘুরে রিহার্সাল দিয়ে চলেছিলেন তিনি, মনে মনে। হাজার হর্সপাওয়ারের টেনশন তাঁকে স্থির হতে দিচ্ছিল না একবারও। অতিরিক্ত আবেগমনস্ক। ফলে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন তিনি বাধ্যতই। তার ফলেই ঘটে যায় আচম্বিত দুর্ঘটনা। তাঁর পতনের শব্দে একতলার ভাড়াটে এবং দোতলার নিজের সংসারের লোকজন ছুটে আসে ছাদে। ছদের এক প্রান্তে দাঁড় করিয়ে রাখা বাঁশের স্তূপের

তলদেশ থেকে তাঁকে টেনে বের করতে বেশ হিমসিম খেয়ে যায় সকলে।

না, তিনি অজ্ঞান অথবা অচৈতন্য হননি এতটুকুও। হবেনই বা কেন? তিনি এখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সপক্ষে একজন অপরাজেয় যোদ্ধা।

চশমাটাই যা ভেঙেছে শুধু।

বিকেলের বক্তৃতায় তিনি শুধু দেখতে পাবেন না কলকাতা তাঁকে কিভাবে দেখছে।

গান থেকে ফেরা

রবীন্দ্রসদন থেকে বেরিয়ে তেরো মিনিটের মাথায় দুজনে পাশাপাশি বসবার সীট-সহ বাড়ি-ফেরার প্রাইভেট বাস, টাটা-সেণ্টারের কাছে ময়দানের কুলপি-বরফ হাওয়া, বারংবার বুকের উপর নমিতার সিল্কের শাড়ির আঁচল, অনেকদিন পরে নমিতার গায়ে সিল্কের শাড়ি, নমিতার চুলে ফল্‌স দিয়ে বানানো ঘটির মাপের খোঁপা, নমিতার মুখে ভাঁজহীন প্রশান্তি, গান ভাঙার পর ব্যাক-স্টেজে সুচিত্রা মিত্রের সঙ্গে নমিতার মিনিট কয়েকের মিষ্টি আলাপের অপ্রত্যাশিত ঘটনা, আলাপের সময় নমিতার হঠাৎ বিয়ের আগের নমিতা হয়ে-যাওয়া, বিয়ের বাইশ বছর পরেও যোগ্য পরিবেশে শরীর ও মনের পাথর খসিয়ে প্রবল-সংসারী নমিতার পক্ষে কুমারী নমিতায় প্রত্যাবর্তনের অপচয়হীন ক্ষমতার পরিচয়, আর সর্বোপরি নিজের মধ্যে ইণ্টারভ্যালের আগে ও পরে মিলিয়ে বাইশটা গানের সুর, প্রায় আক্রমণের মতো তাদের অন্তর্ভেদ, রক্তের মধ্যে গানগুলোর ঢুকে পড়া, গান থেকে পাওয়া যন্ত্রণাদায়ক আরাম অথবা আরামদায়ক যন্ত্রণার অস্থির আবেগ, ইত্যাদি কার্যকারণের সমবেত প্রতিক্রিয়ায় বাসুদেব ক্রমশ অন্য বাসুদেব হয়ে যেতে থাকে যেন। টাটা সেণ্টার থেকে পার্ক স্ট্রিটের স্টপেজে বাসটা পেঁছনোর মধ্যেই বাসুদেব নিজের চেতনায় সংক্রামিত করে ফেলতে পারে অবিশ্বাস্য এবং আবছা এক বিশ্বাস। কোনো একটা বস্তুর নির্দিষ্ট চেহারা না পাওয়া পর্যন্ত কুমোরের চাকা যেভাবে ঘোরে, বাসুদেবের বিশ্বাসও সুনির্দিষ্ট অবয়ব না-পাওয়ায় একাধিক বিশ্বাসী-ভাবনার ভগ্নাংশের মধ্যে ঘুরে চলেছিল তখনও। ভগ্নাংশগুলো এই রকম—

১। এদিন আজি কোন্ ঘরে গো-র মতো হঠাৎ খুলে যেতেও তো পারে!

২। উচ্চমধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তরা তো আকাশ থেকে পড়ে না। আমরাই হয়ে যাই, হয়ে যেত পারি অবস্থার অনুকূলতার···

৩। না, উচ্চবিত্ত হওয়ার স্বপ্ন হিসেবে এটা ভাবা ভুল। ওভাবে ভাবছিও না। আসলে মধ্যবিত্ত পরিবারে এমন কিছু গ্লানি থাকে···

৪। মধ্যবিত্ত পরিবার ইচ্ছে করলে অতিক্রম করে যেতে পারে যে সব খুচরো সমস্যা, সেগুলোকে তারা পুষতে চায়···

৫। ইচ্ছে করলেই আমরা বদলাতে পারি আমাদের স্বভাব, মোড অফ একস্‌প্রেসন···

৬। সুচিত্রা মিত্রের সঙ্গে কথা বলার সময়ে নমিতা আজ যা পারল, বাকি জীবনে কেন তা পারবে না?

৭। আমি যদি মনে করি আধলা পয়সাতেও রাজাধিরাজ, কার কি?

৮। খুব বদলানো যায় নমিতা, সংসারের সঙ্গে এঁটুলির মতো নিজেকে এঁটে রেখেছ বলেই সব সময়ে এত অমাবস্যা···

৯। অসুবিধে, অন্যায়, উপদ্রব, উৎকণ্ঠা বিশৃঙ্খলা এসব আমাদের মতো পরিবারে থাকেই। তা বলে তুমি তোমার প্রতিভার, ক্ষমতার···

১০। পারা যায় নমিতা, পারা যায়। আমিই তোমাকে দিয়ে ঘটাবো। আজ প্রভাতে সূর্য ওঠা তোমার জীবনে সফল হয় কি না দেখো···

বাসটা পার্ক স্ট্রীট ছাড়াতেই বাসুদেব মনে মনে পাকা করে নেয় তার সদিচ্ছার সংকল্প।

—তোমার গরম লাগছে?

—না।

—লাগলে, তুমি এদিকে চলে এসো। জানলার দিকে।

উত্তর না দিয়ে নমিতা মাথা নাড়ে। কি যেন ভাবছে নমিতা। বহুকালের বন্ধ স্মৃতির সুটকেশটা খুলতে চাইছে হয়তো। খুলুক। আমি চাই মৃত্যুর আগের মুহূর্তের মতো ভয়ঙ্করভাবে ও তলিয়ে যাক স্মৃতিতে। ওর মনে পড়ুক সব। দরজা খুলতে খুলতে ও পৌঁছে যাক সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে, মাকড়শার জাল সরিয়ে, ধুলো মুছে প্রকাণ্ড একটা ওভাল-শেপের আয়নায় ও দেখতে থাকুক ওর স্কটিশ, ওর কার্জন পার্কের অভিসারের রাত, ওর গীতবিতান, ওর গানের সকাল-বিকেল, ওর গানের মেডেল, গায়ের যৌবনের চেয়ে গানের যৌবনের টানে ওর চারপাশে স্তাবকতা-মুখর মাছিদের ওড়াউড়ি, গানের মতোই ওর আঁচল-উড়িয়ে হাঁটা, গানের মীড়-এর মতো ওর যৌবনকালের হাসি, ওর গানের খাতা যা ছুঁতে দিতো না কাউকে, কফি হাউসে আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ হঠাৎ ওর গুনগুনিয়ে ওঠা, কলেজ সোশ্যালে ওর গানের আগুনের লকলকে শিখায় আমাদের সর্বাঙ্গ ঝলসে যাওয়ার আনন্দ। সব মনে পড়ুক ওর।

কিছুতেই বেরোতে চাইছিল না। সংসার যেন দশ দিকের শিকলে বেঁধেছে, এই রকম ভঙ্গিতে ওর আপত্তি। সে-সবের সপক্ষে যে যুক্তি বা দৃষ্টান্ত নেই, তা নয়। তবু বেরোনো যায়। তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের অখণ্ড কর্মব্যস্ততা থেকে অনায়াসেই খুবলে তুলে নেওয়া যায় ঘণ্টা তিনেকের ছুটি। এই বাহান্ন-পাকের সংসার থেকেই তো তুমি যেতে পারো বিয়ে বাড়ির কি অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্নে, যেতে পারো কদাচিৎ-কদাচিৎ-এর সিনেমায়, পাশের বাড়ির টিভিকে দিতে পারো কয়েক ঘণ্টা। তাহলে আজকের এমন দুর্লভ সুযোগকে দিতে পারবে না কেন খানিকটা সময়? পঁচিশ টাকার টিকিট পয়সা দিয়ে কিনতে হয়নি। সুকোমল নিজে অপিসে এসে উপহারের মতো হাতে তুলে দিয়ে গেছে।

সুকোমল আজকের এই গানের আসরের অন্যতম উদ্যোক্তা। কবেকার ছাত্র-জীবনের মেলামেশা আর তোমার গানের সম্পর্কে ওর সেই কবেকার মুগ্ধতা মনে রেখেই ছুটে এসেছিল সে। দশবার আউড়েছে টিকিট দুটো হাতে দেবার সময়, নমিতাকে সঙ্গে আনা চাইই কিন্তু। ওর বলার ভঙ্গিতে আমার সম্পর্কে ফুটে উঠেছিল একটা চোরা অভিযোগ : যেন আমি চাই না নমিতার জীবনের ব্যাপ্তি। যেন আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলেই নমিতার জীবনের দিক-দিগন্তময় সম্ভাবনা আটকে গেল ভাতের হাঁড়ির সংকীর্ণ পরিধিতে।

নিজের মনে এসব ভাবতে-ভাবতেই বাসুদেব আবার ঘুরে তাকায় নমিতার দিকে। বাসটা তখন গ্র্যান্ড হোটেলের কাছাকাছি স্টপেজে। অনেক লোক নামছে। অনেক লোক উঠছে। শব্দের ঝড়-বৃষ্টি। বিরক্ত হয় না বাসুদেব। বরং শব্দটাকেই বানিয়ে নেয় নিভৃত হওয়ার চমৎকার এক আচ্ছাদন, রিকশার পর্দার মতো। যে কোনো ঘনিষ্ঠ কথা বলে নেওয়া যায় এখন। অন্যের কানে পৌঁছবার আগে ভেঙে-চুরে হারিয়ে যাবে অন্যসব সাধারণ কথার হুটোপাটিতে।

—সুচিত্রাদি আমাকে কি রকম টুক্ করে একটু খোঁচা মারলেন, দেখলে ?

—কখন ?

—তখন তুমি তোমার এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলে।

—কি বললেন ?

—আপনি ওর গানের ট্যালেন্টটাকে নষ্ট হতে দিলেন কেন ? ওর যে রকম গলা ছিল, সেটা ভেরী রেয়ার। তার মানে দাঁড়াল, আমিই হলাম যত নষ্টের মূল।

বাসুদেবের দিকে ঘুরে নমিতা হাসে, বিজ্ঞাপনের মডেলের

মতো মনের কথাকে চোখে ফুটিয়ে। বাসুদেব সে হাসিতে পড়ে নিল, তুমি দোষী হতে যাবে কেন ?

—আমাকে তো বললেন ?

—আমার সম্বন্ধে ?

—না, আমার না-গাওয়া নিয়ে।

—তুমি কি বললে ?

—কি আর বলবো। হাসলাম। ওঁরা তো আর আমাদের মতো সংসার-ধর্ম করেন না। ঝাড়া হাত-পা-র জীবন। ওঁদের পক্ষে যা-খুশি ভাবা সম্ভব।

—কিন্তু এত বছর পরেও তো তোমাকে চিনলেন ? তোমার গলার তারিফ করলেন। তোমার ট্যালেণ্টকে রেকগনাইজ করলেন। না করলেও তো পারতেন।

বাস ছেড়ে দেয়। ওদের সীটের সামনে এক গুচ্ছ যাত্রী। ছাতার মতো বেঁকে রয়েছে তাদের শরীর ওদের মাথার উপরে। বাসুদেবের হাতে স্যুভেনির। সেটা দেখার ছল করে একজন ছোকরা নমিতার গায়ে হাঁটু লাগিয়ে ঝুঁকে রয়েছে তার ঘাড়ের উপর। বাসুদেব হঠাৎ চুপ। নমিতাকে বিশ্বাস নেই। হয়তো বাসের মধ্যেই কোনো কথার উত্তরে বাড়ির মতো ঝাঁঝিয়ে তুলল গলা। বাসুদেব সুযোগের অপেক্ষায়। কথা বলার মতো ফাঁক পেলেই নিজের সদিচ্ছার প্রসঙ্গটা তুলবে। নিজের সপক্ষে যুক্তিগুলোকে সাজাতে থাকে সে এই ফাঁকে।

১। তোমার এই ধারণাটা খুব ভুল নমিতা। ঝাড়া-হাত-পা হলেই গান গাওয়া যায় শুধু ? অর্থাৎ যারা গান গায় বা অভিনয় করে, তাদের সংসার নেই, সাংসারিক ঝামেলা নেই, ঝি-এর কামাই নেই, রাঁধুনির উপদ্রব নেই, তাদের বাড়িতে অসুখ-বিসুখ নেই, শোক-তাপ নেই, একেবারে মোজেইকের মেঝের মতো ঝকঝকে-তকতকে জীবন ?

২। তুমি বলবে ছেলেমেয়েরা অবাধ্য বলেই সংসার নিয়ে তোমার দিনরাতের ভাবনা। সংসারকে দিনরাত দুহাতে আগলে থাকা। কিন্তু আমি বলব অতটা না থাকলেই চলতো। এখনকার ছেলেমেয়েরা আমাদের সময়কার ছেলেমেয়ে নয়। ওরা অনেক বেশি স্বাধীনতা চায়। ওরা অনেক বেশি পরিমাণে আত্মসচেতন, ওরা ভুল করলেও, সে ভুলের কৈফিয়ৎ চাইলে আরো দুটো বেশি ভুল করার জেদ পুষতে থাকে মনে। সঙ্গের দোষে হোক, ভুল আবহাওয়ার প্রভাবে হোক, আধুনিক যুগের নিয়মেই হোক ওদের একটা ছাঁচ তৈরি হয়ে গেছে বাঁচার, বড় হওয়ার, জীবনযাপনের।

৩। তুমি অর্থাভাবের কথা তুলবে। সংসারের এটা হয় না, ওটা হয় না, তিন মাসে ছেঁড়া বালিশের ওয়াড় কেনা যায় না যেখানে, সেখানে গানের শুকনো গলাকে ঝালিয়ে নিতে মাসে মাসে পঞ্চাশটা টাকা খরচের ঝক্কিটা সামলাবে কি করে শুনি? ঠিক। মাসে পঞ্চাশ টাকা অনেক, কিন্তু একটু ভেবে-চিন্তে খরচ করলে—

হঠাৎ দমকা ব্রেক কষে থেমে যায় বাসটা। দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষগুলো ছিটকে পড়ে দশদিকে, এ-ওর ঘাড়ে। মৃত্যু-কান্নার মতো আর্তনাদ করে ওঠে মহিলারা। পুরুষদের আর্তনাদ-সুলভ নানা-রকম শব্দ। মহিলা এবং পুরুষের সমবেত আর্তধ্বনিতে বিভীষিকাময়, বাসের ভিতরটা। বাসুদেব খুব দ্রুত সামনের সীটটাকে ধরতে পেরেছিল বলেই বাঁচাতে পারে মাথাটাকে। চোখের চশমাটা ভেঙে চুরমার হওয়ার কথা। না-ভেঙে চোখ থেকে ছিটকে পড়ছিল নিচেয়। সেটাও জাপটে ধরে ডানহাতে অসম্ভব ক্ষিপ্রতায়। কলকাতা শহরের নিয়মিত বাসযাত্রীদের একজন বলেই বাসুদেবের অবচেতন সব সময়েই থাকে, এবং ঐ সময়েও ছিল, আকস্মিক আত্মরক্ষার জন্য সতর্ক। কিন্তু নমিতা যেহেতু ইদানীং অনভ্যস্ত, তাই মরণাপন্নের গোঙানি তুলে সমস্ত শরীরটা

ছিটকে বেঁকে ধাক্কা খাওয়ার জন্য এগিয়ে গিয়েছিল সামনের সীটের দিকে। দৈবক্রমে সেও বেঁচে যায় আঘাত থেকে, যেহেতু দাঁড়ানো একজন ঐ সময়েই বেঁকে পাক খেয়ে ঝুলে পড়েছিল একেবারে নমিতার গায়ে।

—লেগেছে ?

নিজেকে সামলে বাসুদেব চশমা ধরা হাতটাকে নিয়েই নমিতাকে জড়িয়ে ধরে প্রায়।

—না।

বাসের মধ্যে বিকট হৈচৈ। সমস্ত যাত্রীর মুখ এবং মুখের অশ্রাব্য আস্ফালন ঘুরে যায় ড্রাইভারের দিকে। ড্রাইভার কোনো জবাব দেয় না। জবাব দেওয়ার দরকারও হয় না। কারণ এই ফাঁকেই যাত্রীরা বুঝে গেছে সামনে লম্বা ট্রাফিক জ্যাম। ট্রাফিক জ্যাম জেনেও বাসের কলরব-মুখর হট্টগোল থামে না। শুধু ড্রাইভারকে ছেড়ে সেটা বাঁক নেয় রাজনীতি, দেশ-শাসনের অক্ষমতা ইত্যাদির দিকে।

—চশমাটা বেঁচে গেছে খুব জোর।

নমিতাকে দেখিয়েই চশমাটা পাঞ্জাবির কাপড়ে মোছে বাসুদেব। চশমা মুছতে মুছতে নমিতাকে দেখে। বেশ ঘাবড়ে গেছে। দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাদের বিষণ্ণতার শব্দের ঝাপটায় ও যেন বেশি বিচলিত। নমিতাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে, নাকি নিজের প্রতি নমিতার সমবেদনা আকর্ষণের জন্যে বাসুদেব বলে —এ আর এমন কি, এক একদিন যা হয়, বেঁচে বাড়ি ফেরাটাই—

কথাটা শেষ হবার আগেই জানলার বাইরে থেকে একটা লম্বা হাড়সার হাত এগিয়ে আসে তার দিকে।

—সারাদিন কিছু খাইনি। বাবা গো, ও বাবা, দয়া করো বাবা···

—আগে আগে···

—মা, ওমা, দয়াময়ী মা গো···

—আগে আগে···

হাতটা জানালার বাইরে সরে না-যাওয়া পর্যন্ত বাসুদেব ঐ একই কথা জপের মন্ত্রের মতো আউড়ে যায়। হাতটা সরে গেলে নমিতার উরুতে হাত রেখে নাড়া দেয় আলতো। নমিতা পায়ের দিকের শাড়ি গোছাচ্ছিল নিচু হয়ে।

—কি হল, ছিঁড়েছে ?

—না।

না-টা মুখে বলে না, বলে ভয় পাওয়া, শান্ত, ভিজে ভোরবেলার মতো চাউনিতে। অনেকদিন পরে নমিতার চোখে দাপটহীন, খর-উজ্জ্বলতাহীন স্নিগ্ধতার স্বাদ পেয়ে বাসুদেবের মনে পড়ে যায় নমিতার বিয়ের আগের চোখের মেঘমেদুরতা। বিয়ের পরে পুরী থেকে বেড়িয়ে আসার পর সমুদ্র নাচতো ওর চোখে। তীরের ফেনা-উগরোনো সমুদ্র নয়, দূরের সবুজ-নীল সমুদ্র, যা গাঢ়, যা তলহীন, মৃত্যুভয় বিছিয়েও যার নিরবচ্ছিন্ন হাতছানির অমোঘ টান। সুকোমল কলেজ ম্যাগাজিনে কবিতা লিখেছিল একবার ওর চোখ নিয়ে। হয়তো এখনো আগাছার কাঁটায় কাপড় আটকানো পিছুটানের মতো ওর চোখের, সিন্ধু বারোয়াঁ কিংবা ভৈরবী কিংবা জয়জয়ন্তীর ভীষণ উদাস হাহাকার-জাগানো ওর গানের স্মৃতি বুকের ভিতরের কোনো গোপন চোরাকুঠরীর আড়ালে বাঁচিয়ে রেখেছে সুকোমল। রেখেছে, নইলে এত বছর পরেও পঁচিশ টাকা দামের দু-দুখানা টিকিট যেচে হাতে গুঁজে দিতে আসে কেউ আজকাল, আজকালের কম্পিউটারে-কষা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের চুলচেরা এবং দ্রুতগতি হিসেব-নিকেশের সেয়ানা বাজারে ?

এখন কথা বলা যায়। কেননা গোটা বাসটা এখন বিতর্ক মুখর। বেসামাল বিধানসভার আর এক পথ-সংস্করণ যেন।

বাসুদেবের স্নেহ-ভালোবাসাময় হাতের পাঁচটা আঙুল নমিতার হাতের আঙুলের মধ্যে ঢুকে চুলের বিনুনী বুনতে চায় যেন।

—সুকোমল কিছু বলল?

—কাকে?

—তোমাকে?

—কি বিষয়ে?

—গান-টান বা অন্য কিছু…

—গান-টান নিয়ে কি বলবে? এমনি কথা বলছিল। বলছিল মেডিকেল রিপ্রেসেনটেটিভ হিসেবে আমাদের পাড়ায় ডাঃ চ্যাটার্জীর ডিসপেনসারিতে নাকি প্রায় আসতে হয় ওকে। সময় হাতে থাকলে একদিন চলে আসবে।

—সুকোমল এলেই জব্দ হবে তুমি।

—কিসের জব্দ করবে? আজবাজে কথা বলছ কেন?

নমিতার মুখের আদলে, ভ্রূভঙ্গিতে, চোখের খর তাকানোয় এতক্ষণের স্নিগ্ধ প্রশান্তিটা শুকনো চন্দনের মতো ফেটে পড়ার উপক্রম হচ্ছে দেখে বাসুদেব ঘাবড়ে যায় একটু।

—কথার মানে না বুঝে রাগ করো কেন বলতো?

বাসুদেব কোনো রকম রাগের ঝাঁঝ না এনে, মুখে-মাখার ক্রীমের মতো মোলায়েম করে নেয় নিজের গলার স্বর।

—সুকোমল যদি আসে, তোমার গলার গান না শুনে ও ছাড়বে।

—তা তো বটেই। আমি যেন গ্রামোফোন আর কি!

সুকোমলের কথাটাকে বেমক্কা পেড়ে-ফেলা যে ট্যাকটিক্যালি ভুল হয়েছে এটা বুঝতে পেরে বাসুদেব নিজেকেই চোখ রাঙায় মনে মনে। নমিতার হালকা-বিরক্তিটাকে ওর মুখ থেকে মুছে তুলে ফেলার অভিপ্রায়ে টাগরায় জিভ ঘসে ঘসে বাসুদেব যখন তার মুখের কথাগুলোকে তুলতুলে তুলো বানাতে চাইছিল, বাসটা

চলতে শুরু করে তখনই। নমিতার আঙুলে জড়ানো তার আঙুলগুলো কি রাখা উচিত নমিতার ঊরুর উপর ? কেউ হয়তো ভাবতে পারে প্রেম করছি পরস্ত্রীর সঙ্গে। বাসুদেব হাত সরিয়ে নেয়।

অনেকক্ষণ পরে খালি রাস্তা পেয়ে বাসটা দৌড়তে থাকে হঠাৎ। এত জোরে দৌড়ায় যে, একটু আগে কি যেন ভাবছিলো সেটা মনে করতে করতেই সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ আর বিবেকানন্দের মোড়ে পেঁাছে যায় বাসটা। বাসুদেব আবার খুঁজে পায় হারানো ভাবনার খেই।

১। পঞ্চাশ টাকা ? হ্যাঁ, পঞ্চাশ টাকা আমাদের সংসারে যে অনেক টাকা, আমি স্বীকার করছি। কিন্তু ইচ্ছে করলে, একটু হিসেব-কষে খরচ করলেও টাকাটা বাঁচানো এমন কিছু দুঃসাধ্য নয়। ঐ যে ধরো, তোমার পিসতুতো ভায়ের ছেলের মুখে-ভাতে আমরা দুধ খাওয়াবার ঝিনুক-বাটি প্রেজেণ্ট করলাম ওটা না করলেও চলতো। ওদের অবস্থা এমন নয় যে, আমাদের কাছ থেকে ঐ উপহারটা না পেলে দুধের ছেলের মুখে দুধ ঢুকবে না। আমার সাধ্যের বাইরে খরচ করেছিলাম খানিকটা অভিভূত হয়ে। আমার চেয়ে আবেগে উথলে উঠেছিলো তোমারই বেশি। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বিরাট অফিসার হয়েছে। চোদ্দ বছর কোনো সম্পর্ক না রেখেও হঠাৎ মেরুন রঙের গাড়ি হাঁকিয়ে যেই নেমন্তন্ন করতে এল তোমাকে, গলে গেলে। একদম না যাওয়াটা মোটেই ভালো নয়, ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, ওদের চাকরি-বাকরির ব্যাপারে কখন কি কাজে লাগে এই সব অকাট্য যুক্তি যুগিয়ে ছিলে তুমিই। উপকার করবে না ছাই। আসলে তো নিজেদের নবাবীয়ানার লম্বা-চওড়া বহর দেখিয়ে আমাদের চোখকে কানা করার জন্যই নেমন্তন্নটা।

২। ওসব কথা যদি বাদও দিই, তবুও, মানে একটু কসাস্ হয়ে খরচ করলে মাসে পঞ্চাশ টাকা বাঁচানো যায়। আর তেমন

দরকারে বছরখানেক না হয় ছেড়েই দেবো সিগারেট খাওয়া। আমাদের অফিসের অনেকেই বিড়ি খায় এখন, আগে যারা ফিলটার টানতো।

৩। একবছর কেন বলছি? তুমি যদি নিয়ম মেনে, এক বছর ঠিক মতো রেওয়াজ করে রিভাইজ করে নিতে পারো তোমার গলা, তারপর দেখবে দশটা গানের ইনস্‌টিটিউশান থেকে ডাক আসছে তোমার, গান শেখানোর জন্যে। এমনকি তুমি নিজেও বাড়িতে শুরু করে দিতে পারো গানের টিউশনি। তখন নিশ্চয়ই আজকের মতো গুনে-গেঁথে, পাই-পয়সা মেপে খরচ করতে হবে না আমাদের। তুমি আমি দুজনে রোজগার করলে—পাঁচ বছর পরে নিজেদের একটা একতলা বাড়িও···

আবার একটা হৈ-হুল্লোড়। বাসুদেব জানলায় মুখ বাড়িয়েই বুঝে গেল, শ্যামবাজার। হুড়মুড়িয়ে অর্ধেক লোক নেমে যাচ্ছে। যত নামছে, বাসের দুদিকের দরজার সামনে তার দুগুণ লোকের ভিড়, ফলের দোকানের খেজুরের মতো গায়ে গায়ে ডেলা পাকানো। বাসটা এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে। ফলে হট্টগোল চলবেই। বাসুদেবের মনে হলো, আর চার-পাঁচটা স্টপেজ পরেই নামতে হবে যেহেতু, একটু-একটু করে আসল বক্তব্যের অর্থাৎ তার সদিচ্ছাময় সংকল্পের দিকে এগোনো উচিত এবার।

—এরা কত করে নেয় মাসে?

—কারা?

—নর্থ ক্যালকাটা সঙ্গীতায়ন।

—কিসের জন্যে?

—গান শেখানোর ফি?

—কে শিখবে?

—আরে, বাসুদা? ওমা, বৌদিও যে? আরে ব্বাবা, জোড়ে বেরিয়েছে দেখছি। কোথায়?

বাসুদেব ঘাড় তুলে ভিড়ের মধ্যে দেখতে পায় কেবল কমলেশের মুখ। তার বাকি দেহটা ভিড়ে আড়াল-করা। কমলেশ, তাদের গলির চেনা-জানা এক প্রতিবেশী।

—রবীন্দ্রসদনে গিয়েছিলাম।

—চীনের ব্যালে ছিল নাকি ?

—চীনের ব্যালে ? সেতো কবে হয়ে গেছে।

—তাহলে ?

—সুচিত্রা মিত্রর একক গানের আসর। তোমার বৌদি তো ওঁরই কাছে গান শিখতেন আগে। ইনভিটেশন।

ইনভিটেশন শব্দটাকে অসম্ভব কৌশলে ব্যবহার করতে পেরে বাসুদেব খুশি হয়। এমনভাবে উচ্চারণ, যাতে কমলেশ ছাড়াও ভিড়ের কিছু লোকও বুঝে যায় যে তারা সরাসরি নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়েছে সুচিত্রা মিত্রের কাছ থেকে। উত্তরটা শুনে কমলেশ ভিড়ের ভিতর থেকেই গলা ছাড়ে।

—তাই নাকি ? মাই গড ! বৌদি গান জানে, এ কথাটা এ্যাদ্দিন বেমালুম চেপে গিয়েছিলেন আমাদের কাছে ? সাত বচ্ছর এক পাড়ায় বাস করছি—অথচ···

বাসুদেব তার হাঁটুর নিচে চিমটি-কাটার মতো মৃদু জ্বালা অনুভব করে নমিতার দিকে ঘুরে তাকায় এই সময়। নমিতা নাকের পাতা ফুলিয়ে কড়া শাসনের ভঙ্গিতে চোখ টেপে। বাসুদেব চুপ করে গিয়ে মনে মনে হিসেব কষে দেখে আর মাত্র দুটো স্টপেজ বাকি টালা পার্কে পৌঁছতে। বাসের মধ্যে তো মনে হচ্ছে আসল প্রস্তাবটা পাড়া যাবে না আর। বাস থেকে যেটুকু হাঁটার পথ, তখন বলা যাবে কি ? নিজের অক্ষমতার উপরেই রাগের চাবুক কষাতে ইচ্ছে করে বাসুদেবের। নিজের বিয়ে-করা বৌকেও ভালোবেসে বলতে পারে না সে যে, আমি তোমাকে গান শেখাতে চাই ?

বাস থেকে নেমেই নমিতা ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

—একি! একটাও তো রিকশা নেই স্ট্যাণ্ডে?

—রিকশা কি হবে? চলো হেঁটেই যাই গল্প করতে করতে।

—থাক, তোমাকে আর গল্প করতে হবে না। বাসের মধ্যে চেঁচিয়ে যা সব করছিলে—অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

—খারাপ কথা তো বলি নি কিছু।

—চেঁচিয়ে কথা বলাটাও তো খারাপ। তা ছাড়া গানের কথাটা হাজার গণ্ডা মানুষের সামনে চেঁচিয়ে বলে কি লাভ হলো তোমার?

—ও তুমি বুঝবে না। কিছু কিছু কথা ঐভাবে ছাড়তে হয় বাতাসে। ঐ কমলেশই দেখবে ঢাক বাজিয়ে রটিয়ে বেড়াবে কথাটাকে।

—তাতে কার কি মহাভারত লাভ হবে শুনি?

—এখন হবে না। গান শেখা আরম্ভ করলেই হবে!

—কে গান শিখবে?

—তুমি।

—তোমার মাথা-টাতা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?

—কেন, অন্যায়টা কি? আমি তো ঠিকই করছি এক বছর গলাটাকে তৈরি করে নেওয়ার পর গানের একটা স্কুল খুলবো বাড়িতে।

—এইটুকু সময়ের মধ্যে এত স্বপ্ন কখন দেখলে?

—স্বপ্ন কেন হবে। সব দিক ভেবেই বলছি। সুচিত্রাদি যখন বললেন, ওর অমন রেয়ার গলাটাকে নষ্ট হতে দিলেন, তখন থেকেই ভাবছি।

—সুচিত্রাদি বললেন, তুমিও অমনি নাচতে আরম্ভ করে দিলে? গাই না বলেই খাতির। গাইলে দেখতে ভাব-ভঙ্গি অন্যরকম। তাছাড়া আমি হঠাৎ গান শেখা শুরু করলে, তোমাদের

বাড়িতে কি কাণ্ড ঘটবে জানো ? সেটা অনুমান করার ক্ষমতা আছে তোমার ?

—যাই ঘটুক, আমি সামলাবো।

—তাহলে এতদিন সামলাওনি কেন ? গোড়া থেকে সামলালে তোমার ছেলেমেয়ে বেপরোয়া হতে পারতো এমন ?

—তুমি জিনিসটাকে তর্কে টেনে নিয়ে যাচ্ছ কেন ? আমি তোমাকে ভালোবেসে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ···

—থাক, রাস্তার লোককে শুনিয়ে তোমাকে ভালোবাসা দেখাতে হবে না। সুমি যদি টাইমলি না ফেরে, রাঁধুনি এসে ফিরে যাবে। পই পই করে বলে দিয়েছি সাড়ে চারটের মধ্যে ফিরবি। কলেজ থেকে সোজা চলে আসবি বাড়িতে। কোথাও যাবি না।

—হ্যাঁ বলেছে যখন নিশ্চয় ফিরবে। আগে থেকে উত্তেজিত হচ্ছ কেন ?

—হচ্ছি এই জন্যে, রাঁধুনি না এলে, আমাকে গিয়ে এখন হাঁড়ি ঠেলতে হবে। তুমি তো কর না, আমাকেই করতে হয়। তাই ভাবতেও হয় আমাকে। কোথাও বেরিয়ে বাড়ি ফিরে হাত-পা ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম করতে পারলুম না কোনদিন, এমনি বরাত আমার।

বড় রাস্তা থেকে লম্বা গলিতে এসে পড়ে ওরা। এতক্ষণ ছিল দুধারে দোকানপাট। এখন দুধারে চেনা-পরিচিত বাড়ি। আর কথা বলা উচিত নয়। কোন্ কথা কার কানে পেঁছে কি মানে দাঁড়াবে। যতই বাড়ির দিকে এগোবে, নমিতা তার অতীতকে মুছে হয়ে উঠতে থাকবে বর্তমান। গানের নমিতার অভ্যন্তরকে ভেঙে-চুরে খসিয়ে ক্রমশই প্রখরতর হয়ে উঠবে গৃহিণীপনার নমিতা। সাপের শরীরের মতো বাঁক নেওয়া বাড়ি-ফেরার গলিটাকে বাসু-দেবের কখনোই পছন্দ হয়নি তেমন। অন্যসব দিনের চেয়ে আজ অধিকতর সরু সুড়ঙ্গের মতো মনে হলো এই গলিটাকে। মরণাপন্ন

রোগীর শেষ হেঁচকির টানে কন্ঠনালীর অসম ওঠানামার উপমাটাও চোখে ভেসে উঠেছিলো তার। বৃহৎ কোনো সদিচ্ছা সংকল্পকে মনের মধ্যে পুষে হাঁটা যায় না এ গলিতে। হাঁটাটা বেমানান। হাঁটতে গেলে নিজেকেই মনে হবে নিজের স্বপ্নের দরজা ভেঙে ছিটকে আসা অলীক ছায়ামূর্তি। যতক্ষণ বাসের মধ্যে ছিল, চারপাশে অসংখ্য মানুষের থোকার মধ্যে থেকেও সে ছিল একলা একটা মহা বিস্তীর্ণ পৃথিবীর মাঝখানে। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিসিয়ান যেন, হাতের তালুর একটা বলকে দশটা করে করে যার লুফালুফি। এই গলিতে ঢুকলেই বাসুদেব শুধু মাত্র বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, ব্যাঙ্কের কেরানী।

সুমি যদি না ফেরে আমাদের বাড়িতে ঢোকা হবে না। সুমির কাছে বাড়ির চাবি। সুমি ঠিক সময়ে না ফিরলে রাঁধুনি ফিরে যাবে। ঠিকে-ঝি ফিরে যাবে না। তাকে বিকেলে আসতে বারণ করে দেওয়া। সুমি ঠিক সময়ে নাও ফিরতে পারে। ঠিক সময়ে না-ফেরার পক্ষে হয়তো-সত্যি হয়তো-সত্যি-নয় অকাট্য যুক্তিও দেখাতে পারে এক বা একাধিক। সুমির এখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে নাচ দেখানোর বয়স। পৃথিবীর পক্ষে, যে পৃথিবীর ওর ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য যুবকদের সমাবেশে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার মতো সমুজ্জ্বল, ও এখন অপরিহার্য। ওর দ্রুত ঘরে ফেরা মানেই ঐ-সব পৃথিবীতে ঘনান্ধকার। আবার এমন হতে পারে সুমি ঠিক সময়েই ফিরেছে। এমনকি অভিও, তার খেলোয়াড়-বন্ধুদের সঙ্গে রাতভর আড্ডার নিয়মে ব্যতিক্রম ঘটিয়ে। কিন্তু রাঁধুনি আসেনি। ফলে নমিতার পক্ষে অবধারিত রান্নার উনোনের পেট থেকে কয়লার ধোঁয়া ফাঁপিয়ে তোলা। বাড়িতে ফিরেই সিল্কের শাড়িটা হ্যাঁচকা টানে খুলে আটপৌরে ময়লা একটা শাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়বে সে। মাথার চুড়ো খোঁপাটা ভেঙে হাত খোঁপা। নমিতার চোখ, মুখ, চলা, হাঁটা বদলাতে থাকবে ক্রমশ।

আমাদের একতলার দুখানা শোবার ঘর, এক ফালি রান্নাঘর, এক চিলতে খাবার জায়গা, একফোঁটা এঁদো বাথরুম, আমাদের বহু-দিনের চুনকামহীন দেয়াল, আমাদের ঘরের বর্ণহীন অসমতল ফাটল-ধরা স্যাঁতসেঁতে মেঝে, রোদের জন্যে আজীবন হাঁ-করে-থাকা আমাদের উত্তর-দক্ষিণের জানলা, ভিন্নতর এক গানের উদারা-মুদারা-তারায় ওঠা-নামার মতো ঝঙ্কৃত হতে থাকবে নমিতার দুঃখের নালিশে, বেদনার তিরস্কারে, রাগের শাসনে, সুমির আক্রোশে অথবা অভিমানে, অভির উদাসীন নীরবতায়, আমার হঠাৎ-কোনো চিৎকারে, তেতো জিভের কটু মন্তব্যে, ক্ষিপ্ত অথবা রূঢ় আচরণে। আমাদের সংসারের নিচে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে-পড়া ভূমিকম্পটা গা ঝাঁকিয়ে জেগে উঠবে হয়তো আজ রাত্রে।

বাসুদেব নমিতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে পারে না। নমিতা আর কোনোদিন গান গাইবে না এই বোধ ভয়ঙ্কররূপে পরাজিত বাসুদেবের ঘাড়টাকে তার হাঁটুর দিকে, খোয়া-ওঠা গলি-পথের বিপজ্জনক গর্ত-ফাটলের দিকে নুইয়ে দিতে থাকে ক্রমাগত।

জল-কাদার ঘটনা

—ও দাদা, লেডিজটা ছেড়ে···আরে লেডিজ সীটটা ছাড়ুন না দাদা,···কানে কালা নাকি···ও নীল ফতুয়া দাদা···ও মশাই···

কনডাকটার ছাড়া আরও দু-একজন যাত্রীর উপর্যুপরি ডাক। কি একটা বড় মাপের ভাবনায় প্রসাদ তলিয়ে গিয়েছিল আকাশে-বাতাসে। ফকিরের হাতের হ্যাঁচকা টানে আচমকা ঘুম ভাঙে তার। ঘুম-ভাঙার মতো ঝাপসা চোখে সামনেই এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যে দেখতে পেয়ে কোলা ব্যাঙের এক লাফে উঠে দাঁড়ায় সে, উঠে দাঁড়ানোর সময় রাজকন্যর শরীরের পবিত্রতা রক্ষার তাগিদে ইচ্ছাকৃত-ভাবে ধাক্কা মারে অন্য যাত্রীর গায়ে। যাত্রীটি বিরক্ত হয়।

—মাতাল নাকি, সোকাল বেলাতেই টেনে-এ···

বাকি কথাটা হাতের ইশারায়। প্রসাদ সে কথা শুনতে পায় না। সে ফকিরের দিকে তাকিয়ে হাসে। ফকির তার পরিচিত একজন যাত্রী। নিত্য-যাতায়াতের পথেই পাতলা আলাপ।

—আকাশের রকম-সকম দেখতে দেখতে বেহুঁশ হয়ে গিছনু। চরাচর ভাসি দিবে ইবার। কিছু রাখবে নি।

হাসি প্রসাদের একটা চিরকেলে মুদ্রাদোষ। শব্দ করে হাসি নয়। মুখটাকে হাস্যোজ্জ্বল করে রাখার বদভ্যাস। যে কোনো ভয়ংকর বিষাদও তার মুখে উচ্চারিত হওয়ার আগে ধোয়া-মোছা হয়ে যায় হাসিতে। প্রাসাদ এখুনি যা উচ্চারণ করল, সেটিও বিষাদের মাপে ভয়ঙ্কর। এর মধ্যেও রয়ে গেছে সর্বনাশের প্রতি এক সটান ইশারা। যাত্রীদের মধ্যে যারা মেঘের রঙ চেনে, বাতাসের গতিবিধি মুখস্থ, তাদের বুকে হয়তো ইতিমধ্যে গুরগুরিয়ে

উঠেছে এই বাক্যের অন্তর্নিহিত অন্ধকার। প্রসাদের পরিচিত যাত্রীটি প্রসাদের মন্তব্যের জের টানে।

—ই বারও কি মা দুর্গা নৌকোয় আসছেন নাকি? তাহলে তো…

আবার একবার ষড়যন্ত্রময় আকাশের দিকে তাকাতে গিয়ে প্রসাদ ঈষৎ অবাক। প্রসাদের ছেড়ে দেওয়া সীটে রাজকন্যেটি বসে নি তখনো। তার স্বামী, নিজের রুমালে সীটের ভিজে অংশটা মোছামুছি করছেন। রাজকন্যের মুখে কোথাও রৌদ্রকণা নেই। ভুরু ঠোঁট চিবুক এবং চোখে মেঘলা আকাশেরই ছাপ-ছোপ। অবশ্য পৃথিবীতেও রৌদ্রকণার বড় অভাব। কয়েকদিন যাবৎ পৃথিবীর দায়-দায়িত্ব মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়-ঝঞ্ঝার হাতে। গতকাল রাত্রি পর্যন্ত যা বৃষ্টি হয়েছে তাতেই ফসলের মাঠ-ঘাটের বুকে হাঁটু জল। সকলের আশা ছিল আজ সকালে মেঘ ভেঙে আকাশ একটু হাসবে। কিন্তু মেঘ, অনেকটা ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতাদের চালচলনে, একবার গদির স্বাদ পেয়ে আমরণ আঁকড়ে থাকার লালসায়।

রাজকন্যেটি এতক্ষণে বসল। ভুরুতে প্রশ্নচিহ্ন। স্বামীর স্বভাবের প্রতি অবিশ্বাসটা যেন পাকাপোক্ত।

—সব দেখে শুনে তুলেছ তো? মোট পাঁচটা জিনিস, তোমার অ্যাটাচি নিয়ে?

—তুলেছি।

—ডালিম কোথায়? ডালিম ওদিকে একা কেন? ও আমার কাছে আসুক। আর শোনো, বেতের ব্যাগটা বরং আমার কাছে দাও। ডালিম, তুমি এদিকে এসো।

বুকের ভেতর থেকে গোলাপী রঙের ছোট্ট রুমাল বের করে রাজকন্যে মুখ মোছে। রুমাল, না সত্যিকারের গোলাপ? আঃ কি চমৎকার সুবাস!

প্রসাদের নাকে আর তার ঘামের গন্ধ নেই। বাস স্ট্যান্ডের সামনের কচুরীপানায় ভর্তি লম্বা গড়খাই থেকে উঠে আসা আঁশটে জলীয় গন্ধটাও এখন ঘায়েল। গন্ধ সম্পর্কে প্রসাদের চাষাড়ে মনে হঠাৎ নানারকম উটকো ভাবনার বুদ্‌বুদ্‌ কাটে।

হ্যাঁ, ইটে সত্যি কথা। গন্ধে কি যেন একটা আছে। উ-বছর যখন রেশনে পচা চাল দিচ্ছিল, তখন যে সব জিনিস পচা নয়, যেমন আলু-কুমড়ো-নুন-চিনি-কাঁচা লঙ্কা-কোদাল-কাঠারি-গেলাস-বাটি-মানুষজনের কথাবাত্তা-বৌ-ছেলে-মেয়ের সংসারের সাত-সতেরো সাড়া-শব্দ, সব কিছুর গায়েই যেন কে লেপ্‌টে দিয়েছিল সেই পচা গন্ধোটা। আবার ধর, কাজ করতেছি, কাজ করতেছি, খিদে তিষ্টের বোধ নেই। হোটাৎ ভাঁট ফুলের গন্ধোটা নাকে ঢুকে এমন করে দিল, পেটের খিদে নাফিয়ে এগদম জিভে। গন্ধের খানিকটে ক্ষেম্‌তা আছে বটে!

ডালিম তার মায়ের কাছে আসে। ডালিমের যাওয়ার জন্যে প্রসাদকে কোমর বাঁকাতে হয়। ডালিম যেন আট বছরের সত্যিই পাকা ডালিম একটি।

—জানলাটা খুলে দাওনা মা, বড্ড গরম লাগছে।

—না, জানলা খোলা যাবে না। বৃষ্টি পড়ছে।

—খুব তো জোরে পড়ছে না।

—তা হলেও ভিজে যাবে তুমি। এমনিতেই যেটুকু ভিজেছো তাতেই ভয় করছে সর্দি-টর্দি না হয়ে যায়।

প্রসাদ কষ্ট পায় ডালিমের জন্যে। শহরের মেয়ে তো, পাড়াগাঁয়ের বাসে চেপে এখন বেশ যাতনায়। বাসটা ছাড়ার পর বেচারীর দম বন্দো হয়ে যাবে। এখন তো শুদু গায়ে গায়ে ভিড়। ঠেলে-ঠুলে হাঁটা চলা যাচ্ছে। সাড়ে দশটার লুক্যাল এসে পেঁচুলে, বাসে এখন যত জনা, আরো এত জনা লোক গেদে-গুচ্ছে উঠবে যখন, নিশ্বেস নেবার ফাঁক থাকবেনি কোথাও। মাথা হেঁট

তো মাথা হেঁট। পা শূন্যে তো পা ঐ শূন্যেই। ত্রিভঙ্গ মুরারী তো সারাক্ষণ ত্রিভঙ্গ মুরারী। কড়ে আঙুলটিও নড়াবার ক্ষেমতা রাখবেনি কারো।

ডালিমের লাল জামা, পুতুল পুতুল মুখ, মুখে ভ্যাপসা গরমে হাঁপিয়ে ওঠা বিরক্তি, চব্‌চবে ঘাম, প্রসাদের মনটাকে মায়াময় করে তুলেছিল এমন যে, আচমকা সে একটা হাঁক ছাড়ে মাতব্বরী চালে।

—আরে বাবু, বিষ্টি-বাদলার দিনে আর কেউ এসবেনি। ছাড়ো তো। কতক্ষণ এই খুঁয়োড়ে দাঁড়ি দাঁড়ি পচবো?

প্রসাদের চিৎকারে একটা চুলও নড়ে না। নড়বার কথাও নয়। অন্য কেউ অমন চিৎকার করলে প্রসাদেরও নড়তো না। যে-বাস আধঘণ্টা পরে ছাড়বে, মোটামুটি পা রাখার একটু জায়গার জন্যে আধ ঘণ্টা আগে তার ভিতরে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঘটনা হিসেবে নিত্য-নৈমিত্তিক, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। প্রসাদের এখন এটাকে খোঁয়াড় মনে হওয়াটাই বরং আশ্চর্যের। ডালিমের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে ডালিমের মনের কাতরতাকেই সে হয়তো মুখর করতে চেয়েছিল তার চিৎকারে।

বাসের ভিতরটা বোবা নয়। যাত্রীদের মধ্যে বাক্যবিনিময় স্বতঃস্ফূর্তই। নানাকথার হালকা, এবং জোরালো আওয়াজ মিলেমিশে একটা স্থায়ী গুঞ্জরণের সঙ্গে বাসের বাইরের বৃষ্টির ঝাপটার শব্দ, বাতাসের গোঙানি, দোকান বাজারের হাঁকডাকও মিশে রয়েছে। বাসের লোকজনের কথাবার্তা একটু ঢিলে হলেই বাইরের শব্দগুলো চেহারা পেয়ে যায়। বাসের জানলায় কাঠের পাল্লা। স্ক্রু দিয়ে আঁটা পাল্লা নয়। নিচের খোপ থেকে পাল্লাটাকে উপরে টেনে আটকাতে হয়। এখন সেই পাল্লাগুলো বাতাসের ধাক্কায় কেবলই খসে পড়ছে নিচে। তখন জলের ঝাপটাও বাসের ভিতরে। যাত্রীরা কেউ কেউ কনুয়ের ঠেলা দিয়ে সেটা আটকাবার চেষ্টা করতে গিয়ে হিমসিম।

—এই শুনছো।

রাজকন্যের গলা। ঘুরে যায় প্রসাদের চোখ। রাজকন্যের স্বামী ভদ্রলোক বাসের অন্যপ্রান্তে। সেখানে তার ভূমিকাটা পাহারাদার। মালপত্র নিয়ে ওঠার সময় তারা উঠেছিল বাসের পিছনের দরজা দিয়ে। মালপত্র সেইদিকেই। পরে খালি লেডিস সীট পেয়ে রাজকন্যে চলে এসেছে সামনের দরজার দিকে। এইভাবেই ব্যবধান। ভিড় ঠেলে আসতে সময় লাগে ভদ্রলোকের।

স্বামী সামনে এলে রাজকন্যে

—একটা টাওয়েল বের করে দিতে পারবে? এই দেখ না, এখান দিয়ে জল পড়ছে। শাড়িটা ভিজে এ···

—দেখছি, কিন্তু পারবো কি? কোথাও তো ফাঁক নেই এতটুকু। বেতের ব্যাগে নেই কিছু।

—না, টাওয়েল তো রাখি নি ওর মধ্যে।

—দেখি, পারা যায় কিনা।

স্বামী আবার ভিড়ে তলিয়ে যান। প্রসাদ জোরে স্বগতোক্তি করে,

—যাঃ শ্যালা, বিষ্টি তো বাড়লো আবার?

হাওয়ার ঝাপটাটা উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে। রাজকন্যের সীটটা পূব-দক্ষিণ কোণে। ফলে জানলার পাল্লাটা খুলে খুলে পড়ে যাওয়ার বদলে বাতাসের ঠেলায় বেশ আটকানোই। কিন্তু ছাদ বেয়ে গড়ানো জল জানলার উপরের কোন একটা ছিদ্র পথ দিয়ে টুপটাপ গড়িয়ে পড়ছে সীটের উপর। প্রসাদ যখন এখানে বসেছিল তখনও পড়েছে। প্রসাদ সেটাকে গ্রাহ্য করে নি। বৃষ্টির মাত্রাটা বাড়ার ফলেই জলের ফোঁটার মধ্যে এসে গেছে দ্রুততা। ফোঁটাগুলোর আকৃতিও এখন বেশ বড়। রাজকন্যে বিব্রত।

—কি হল, পেলে?

মানুষের ভিড় এবং বহুরকম শব্দ ঠেলে স্বামীর স্বাভাবিক উত্তরটা খানিক দুমড়ে মুচড়ে রাজকন্যের কানে এসে পেঁছয়।

—না, পারছি না।

বিব্রত রাজকন্যে পাশের বয়স্কা গৃহস্থ মহিলাটির দিকে তাকায়।

—একটু সরে বসবেন? দেখছেন তো, জলে ভিজে যাচ্ছি।

জড়োসড়ো গৃহস্থ মহিলাটি এমন ত্রস্ত হয়ে ওঠে যেন তাকে বলা হয়েছে বাস থেকে নেমে যেতে। নাকি সুরে মহিলাটি মড়া-কান্না কেঁদে ওঠার সুরেলা ভঙ্গিতে,

—আঁঃ কুনুদিকে সরবো? পড়ে যাবো নাকি? আবার সরে বসি কোথাকে? এইটুকুন তো জায়গা। সরিটা কোথায়? পড়ে যাবো নাকি?

প্রসাদের প্রাণে মমতার ঢেউ ওঠে। মুহূর্তে বুদ্ধ খৃস্টের জাতে উঠে যায় তার বেদনাবোধ। নিজেকে সংযত রাখা কঠিন হয় তার পক্ষে। সে ঐ মহিলাটির পাশেই। অতঃপর তার পেশীবহুল একটা হাত বয়স্কা মহিলাটির কাঁধ স্পর্শ করে।

—আগো, উনি ভিজতেছেন, দু-ইঞ্চি সরে বোসো না ইদিকে।

এই সময় রাজকন্যেটি সরাসরি প্রসাদের দিকে তাকায়। প্রসাদও সরাসরি রাজকন্যের মুখের দিকে। বাইরে সহসা ভয়াল সরীসৃপের ছুটে যাওয়ার মতো বিদ্যুৎ-রেখা কালশীটে রঙের মেঘ-ভারাতুর আকাশটাকে খানিক চিরে ফেলে। পরক্ষণেই পৃথিবী-ফাটানো জলভারাতুর মেঘগর্জন।

প্রসাদের সর্বাঙ্গে শিহরণ। অন্য সময় হলে শুধু বজ্র ধ্বনিতে সে এতখানি শিউরে উঠত না। কারণ এ জাতীয় ধ্বনির সঙ্গে তার আজীবনের পরিচয়। এই ধ্বনির অন্তর্গত সুখ এবং সর্বনাশ দুইই তার রক্ত-নাড়ীর অভিজ্ঞতা দিয়ে জানা। তার

অতিরিক্ত শিউরোনোর কারণ রাজকন্যের মুখ। প্রসাদের চোখে পলকে তার শৈশবের স্মৃতি।

ঠিক রাণীর মতো লাগে। সেই রকম মুখ। চশমা পরা থাকলে হবে কি, চোখ তো চেনা। হরসুন্দর জেঠার মেয়ে রাণী। হরসুন্দর শতপথী প্রসাদের পাশের গাঁয়ের মোটামুটি অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ। প্রসাদরা চাষী। প্রসাদের বাবার সঙ্গে হরসুন্দরের পরিবারের সম্পর্কটা ছিল চাষা বনাম ব্রাহ্মণের চেয়ে কিছুটা বেশি ঘনিষ্ঠ। সামান্য বিপদে-আপদে, গভীর সাংসারিক প্রয়োজনে কখনো কখনো দিনে দুবারও ডাক পড়েছে প্রসাদের বাবা পরমেশের।

—তাই নাকি? তামলুক থেকে কুটুমরা এসতেছে মোদের রাণীকে দেখতে? জাল নিয়ে এসে মাছ ধরতে হবে? হাঁ গো, উ আর বলতে হবে নি। আমি ঠিক চলে এসবো! কি বললেন সেজো মা? নারকেল তেল? উ নিয়ে ভাববেন নি তো। পেসাদাকে পাঠি দুবো। বস্তায় বেঁধে নারকেল দিয়ে দেবেন। উ নস্করপুর থিকে ভাঙ্গি এনে দিবেখন।

প্রসাদেরও তাই নানা ছুতোয় আসা যাওয়া ছিল হরসুন্দর-বাবুর বাড়িতে, ছেলেবেলা থেকেই। হরসুন্দরের বাড়িতে কোনো বিয়ে-থা বা শ্রাদ্ধ-শান্তি থাকলে পরমেশ আর পরমেশের বৌ-এর ডাক পড়তো তিন দিন আগে থেকে। সেই সুবাদে প্রসাদও মায়ের সঙ্গী। রাণীর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরও রাণীর সঙ্গে ঘরের লোকের মতো খেলাধুলো, স্বচ্ছ, স্বচ্ছন্দ, গায়ে গা লাগানো মেলা-মেশা ছিল প্রসাদের। পরমেশ মারা যাওয়ার পর, প্রসাদের ঘাড়ে যখন থেকে সংসার, মনে কেবল বেঁচে-থাকার হিসেব-নিকেশ, শরীরে রোদ-বৃষ্টির আঁকচারা, তখন থেকেই দূরত্ব, ধীরে ধীরে।

—কিছু মনে করবেন নি। আপনি রাণী তো?

রাণীর শরীরটা স্থাপত্যবৎ অনড় থাকে। কেবল ঘাড় থেকে মাথাটা চাবুকের উৎক্ষেপে দ্রুত মোচড় নেয়।

—কেন বলুন তো ?

প্রসাদ রাণীর ঘাড়ের এই মোচড়টা দেখে দেখে মেলাবার চেষ্টা করে শৈশবের রাণীর সঙ্গে। মেলাবার পক্ষে অন্তরায়গুলোকে, অর্থাৎ রাণীর ছাঁটা চুল, রাণীর চোখের সোনালী ফ্রেমের চশমা, রাণীর কানের তিনপাতাওয়ালা দুল, রাণীর আতপ চালের মতো ফর্সা রঙ, ঠোঁটের লিপিস্টিক, ভুরুর বাঁক, নাকের তীক্ষ্নতা ইত্যাদিকে, যেন সাময়িক, যেন নাকের সিকনির মতো যে কোনো সময়ে ঝেড়ে ফেলা যায়, এইভাবেই মুছে দিয়ে সে আসল রাণীকে খোঁজে। খুঁজে পায়ও। পায় বলেই, অর্থাৎ সে যে রাণীই সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয় বলেই, রাণীর প্রশ্নকে আদৌ কোনো আমল না দিয়ে অন্তরঙ্গ কথোপকথনে নেমে পড়ে।

—চিনতে পারিতেছিন বুঝি ? তা চিনবেই বা কি করে ? বিয়ের পর থিকেন তো আর দেখা নেই, আমি পেসাদ গো ! ইবার মনে পড়তেছে ? তমাদের পাশের গাঁয়ে বাড়ি। আপনার বাবাকে জেঠা ডাকতুন আমি।···

আপনি তুমি দুরকম সম্বোধনেই প্রসাদ কথা বলে যায়। হাসি তার তামাটে মুখমণ্ডলকে পিতল করে রাখে। যদিও তার মুখাবয়ব আখছার মানুষের মতোই উল্লেখযোগ্যতাহীন, তবুও সারল্যে সে যেন ঈষৎ স্বতন্ত্র। তার গলায় কণ্ঠি, না-কামানো গোঁফ-দাড়ির কিছু অংশ পাকা। ডান হাতে লাল সুতোয় বাঁধা বেশ বড় একটি তামার মাদুলি। মাদুলির দুপাশে দুটি রুদ্রাক্ষ। তাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তারকেশ্বরের লাল-সাদা তাগা। এসব হয়তো বা তার ঈশ্বর বিশ্বাসের বিজ্ঞাপন। কিন্তু তার হাসিতে ঈশ্বর অনুপস্থিত, অর্থাৎ অবনত নয় তার ভঙ্গি। বরং আত্মবিশ্বাসে খুঁটির মতোই সোজা। কথা বলার সময় তার মুখ নানান যাত্রীর দিকে ঘোরে। যেন বাসের যাত্রীদের সঙ্গে রাণীর পরিচয় করিয়ে দেওয়াটাও তার দায়-দায়িত্বের অন্তর্গত এখন।

প্রসাদের সব কথা রাণীর কানে যায় না। তাছাড়া দমকা বাতাসে প্রসাদের কিছু কিছু কথা উড়ে যায় যত্রতত্র। রাণীর চোখ জানালার বাইরে। বাইরে দুর্যোগের পৃথিবী। ভয়াবহ কোনো বিয়োগান্ত নাটকের মহড়া চলেছে যেন। জলের ফোঁটা আগের মতোই গড়িয়ে পড়ছে। জানলার কাঠে লেগে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে তার কণাগুলো রাণীর গালে, কানের লতিতে, চুলে, চশমার কাঁচে। চশমার কাঁচটা বার বার মুছতে হয় রাণীকে। ঘাড়ের অনাবৃত অংশটা কনকনে বাতাসে বরফ। ভিজে গেছে ডান দিকের ব্লাউজ। এখন জল গড়িয়ে পড়ছে তার সীটে। এবার কোমরের নিচের অংশটা ভিজবে। ভিতরে ভিতরে কান্না পাচ্ছে রাণীর, তার রাণীসুলভ আভিজাত্য, সাজসজ্জা, ব্যক্তিত্ব সবকিছুই এই সব গ্রাম্যমানুষের সামনে তাদেরই সঙ্গে একাকার হয়ে যাচ্ছে বলে। তার সিল্কের শাড়ি, তার হেয়ার-ডু, তার নেলপালিশ, তার সেণ্ট, তার অ্যানা ফ্রেঞ্চও বাসের ভিতরকার এই আবদ্ধ গোয়ালঘরে তাকে স্বতন্ত্র করে রাখতে পারছে না বলেই নিজের উপর তার বিরক্তিকর অভিমান। ভিতরে অহঙ্কার চুরমার হলেও, বাইরে অবশ্য রাণী নিজের গ্রীবাকে রাজহংসীর মতো গর্বিত করে রাখতে জানে। আবার একবার চশমা মোছার প্রয়োজন হয় তার, চোখ এবং কাঁচ দুটোই ঝাপসা যেহেতু। সিল্কের শাড়ি পেলে বাতাসের ইয়ার্কি ইতর হয়ে ওঠে জেনেই আঁচলটাকে সে কোমরে গুঁজে রেখেছিল শক্ত করে। কোমর থেকে আঁচল খুলে চশমা মোছে। মুঠোয় রাখা রুমালে মুছতে পারে না। রুমালটা ইতিমধ্যেই ভিজে গেছে গাল গলা ঘাড় এদিক-সেদিক মুছতে গিয়ে। তার চশমা মোছার সময়েই ডালিম কাঁদো কাঁদো ভঙ্গিতে বলে

—মা, শীত করছে।

রাণী চশমাটা পরে ডালিমকে দেখে। ডালিম বুকে দুহাত জড়িয়ে জড়োসড়ো। তার গোলাপী আভার মুখটা এখন নীলচে। নিজের অসহায়তা গোপন রেখেই রাণীর উচ্চারণ দৃঢ়।

—কি করি বল তো? কি দিই? সব তো সুটকেশে। আর সুটকেশটা তো বলছে খোলা যাচ্ছে না।

—তুমি বাবাকে ডাকো না।

স্বামীর খোঁজে রাণী ঘাড় বাঁকায়।

প্রসাদ, যেহেতু রাণীর উপরে তার দৃষ্টিটা সর্বক্ষণই বাজ-পাখীর মতো সজাগ, পড়ে নেয় রাণীর মুখের অক্ষর। যেন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এখন উত্তর দিচ্ছে, এইভাবে বলে,

—সুটকেশটা নিয়ে এসতে পারবেন কি ইদিকে? ইদিকটায় এলে না হয় খুলো যেতো।

রাণীর অস্বস্তি লাগে বাসভর্তি মানুষের সামনে একটা চাষাড়ে মানুষের এই গায়ে পড়া অন্তরঙ্গতায়। অপমানই মনে হয় এক ধরনের, প্রসাদ নামটা আবছা মনে পড়লেই বা কী এসে যায়? ছেলেবেলায় অনেক চাষাভুষোর ছেলের সঙ্গেই তাদের বা তার মেলামেশা ছিল। তার মানে এই নয় যে তারা আর আমরা গোত্রে এক। মানমর্যাদায় এক উচ্চতার গাছ। তাল আর শাল সমান সমান যেন।

বাস বোঝাই ভিড়ের মধ্যে লোকটা এমনভাবে কথা বলছে যেন, আমি ওর আত্মীয়। পরম পরিচিত। লোকটা নিশ্চয় তাই ভাবছে। অর্থাৎ আমার এই সাজগোছটা যাই হোক না যেন, আসলে আমি গাঁইয়া।

চাপা রাগটা ঠিক বাইরের বাতাসের মতোর ফুঁসছিল রাণীর ভিতরে। কেননা প্রসাদের অযাচিত অন্তরঙ্গতায় শহুরেপনার সমস্ত তীক্ষ্ণতা সত্ত্বেও সে যেন দুমড়ে যাচ্ছে মোমের পুতুলের

মতো। রাণীর ভিতরে যখন এই বিক্ষোভ, প্রসাদ তখন ইশারায় ইশারায় 'দাদা, ঐ যে লাল কালো ডোরা ডোরা হাফ শার্ট পরা বাবু, ডেকে দিন না', এই ভাবে রাণীর স্বামীকে পেয়ে যায় চোখাচুখি। প্রসাদের ইশারায় ভিড় ঠেলে বাসের অন্য প্রান্ত থেকে ভদ্রলোক অনেক মেহনত করে রাণীর সামনে আসে। রাণী কিছু বলার আগেই প্রসাদ বলে,

—খুকীর ঠাণ্ডা লাগতেছে। আপনাকে খুঁজতেছেন ইনি।

স্বামী ডালিমকে জিজ্ঞেস করে,

—ডালু, শীত লাগছে তোমার?

—হ্যাঁ।

স্বামী নিজের বিপন্নতা মেলে দেয় স্ত্রীর দিকে।

—সুটকেশটা খুলতে না পারলে···ইস্ তুমি তো বেশ ভিজে গেছো।

—আমি একটা কথা বলবো, যদি কিছু মনে না করেন, এনাকে তো আমি চিনি, আপনি আমাকে চিনবেন নি, আপনারা যে গাঁয়ে যাবেন তার পাশের গাঁয়ে বাড়ি আমার, এনাদের পরিবারের সকলেই চিনি আমি, আপনারা তো যাবেন বাঁশুল্লির শতপতিদের বাড়ি, তাই তো? আপনি বরং ইখেনেই দাঁড়ান, আমি সুটকেশটা বয়ে এনে দিচ্ছি। মাথায় করে না নিলে, আনতে পারবেন নি। ইখেনটায় একটু ফাঁকা আছে, এনারা সব সরে দাঁড়িয়ে জায়গা দিবেন খন···

একটানা গড়গড় করে কথাগুলো বলে যায় প্রসাদ। যে কোনো বুদ্ধিমান অথবা বিচক্ষণ ব্যক্তির কাছেই অন্যের গায়ে পড়া পরোপকারের আগ্রহ সন্দেহজনক। স্বামী ভদ্রলোকের প্রতিক্রিয়া স্বভাবতই তার বিপরীত নয়, কারণ তিনি যথেষ্ট শিক্ষিত। নিজের ভুরুতে সন্দেহের ভাঁজ তুলেই তিনি তাঁর স্ত্রীর কোঁচকানো ভুরুর দিকে তাকান।

—তুমি কি বলছিলে ?

—আমি কিছু বলিনি।

—তাহলে ডাকলে যে ?

—আমি তো ডাকিনি ! উনিই গায়ে পড়ে কত রকম কথা বলে চলেছেন। হোয়াট্স হিজ মোটিভ ?

—তাহলে ওর কি হবে, ডালুব ? শীত করছে বলছে যে ?

—আমার আঁচল গায়ে দিক্।

স্বামী ভদ্রলোক চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে একটু থেমে প্রসাদকে একবার দেখে নেন। ভদ্রলোকের চেহারা প্রসাদের চেয়ে অধিকতর সুন্দর তো বটেই, বলিষ্ঠও। চলতি কথায় দশাসই। দশাসই এবং আপাদমস্তকঅভিজাত একটি মানুষ যখন নিজের দাপট দেখানোর প্রয়োজনে কারো দিকে তাকান, সে তাকানোয় অগ্নিচুল্লীর শিখা লক্লকিয়ে ওঠে। নিজের চোখের আগুনে প্রসাদের মুখ ও মনের চরিত্রটা পড়ে নিয়ে স্বামী ঘুরে তাকান রাণীর দিকে।

—সিমপ্লি স্টুপিড। ডোণ্ট ওরি সো মাচ্।

স্বামী ভদ্রলোক চলে যান নিজের জায়গায়। প্রসাদ পাশের অচেনা যাত্রীর দিকে তাকিয়ে চওড়া মাপে হাসে।

—উনি ভাবলেন, আমি বুঝি কুনু মতলবে আছি। ওবিশ্যি ওনার কি দোষ। যা দিনকালের চেয়ারা হয়েছে, মানুষকে মুখের কথায় বিশ্বাস করাটা উচিতও নয়। কি বলেন ?

প্রসাদের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসটা কেঁপে ওঠে। দুদিকের দুটো গেট দিয়ে, ভিজে ছাতা, ভিজে ব্যাগ, সুটকেশ পুঁটলি-পাঁটলা নিয়ে ভেজা আধ-ভেজা একদল যাত্রীর হুড়মুড়। নবাগত যাত্রীদের ধাক্কায় এবং প্রতিরোধহীন চাপে প্রসাদ চলে যায় বাসের মাঝামাঝি।

বাস ছাড়ে মিনিট দুয়েক পরেই। গতি আসার সঙ্গে সঙ্গেই

খড়াৎ, খটাৎ, খটাস জাতীয় শব্দে এক এক করে খসে পড়তে থাকে বাসের তোলা জানলা। আর তখনই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে বাইরের প্রলয়। পৃথিবী কোনদিন সুখে ছিল, মনে হয় না আর। পৃথিবী আবার সুখে ফিরে আসবে এমন ঐকান্তিক এবং স্বাভাবিক প্রত্যাশাকেও মনে হবে অলীক স্বপ্ন, বাসের খোলা জানলার ফ্রেমে দিগ্‌দিগন্তের ছবিতে এমনই সর্বনাশের রঙ।

খোলা জানলা বন্ধ করা, আবার খসে পড়া, আবার বন্ধের সম্মিলিত ধ্বনিটা বাইরের মেঘগর্জন, বৃষ্টির টানা শব্দ আর বাতাসের মার-খাওয়া পশুর হিংস্র গোঙানির সঙ্গে মিশে গিয়ে, ভয়ঙ্কর কোনো পতনের আবহাওয়া গড়ে তোলে। যাত্রীদের সাধারণ উদ্বেগ অস্হিরতার সংলাপকে মনে হয় যেন ভয়ার্ত আর্তনাদ। প্রসাদ এখন নিজের সমস্যায় বোবা।

যুদ্ধ দাঙ্গার মতো এই ঝড়ে তার গোয়ালঘর আর রান্নাঘরের চালটা এতক্ষণে কুঁদহাটার মাঠে উড়ে যায়নি তো ?

॥ ২ ॥

স্টেশন থেকে কাঁকুড়ের বাজারে আসতে অন্য সময় বাসের লাগে পঁয়ত্রিশ মিনিট। আজ লাগল পঁয়তাল্লিশ। তাও পাকা ড্রাইভার বলে। কেননা বাসটা যখন মাঝামাঝি রাস্তায়, তখন থেকেই প্রবল বৃষ্টি। কোন্‌টা রাস্তা, কোন্‌টা মাঠ, কোন্‌টা আকাশ আলাদা করে চিনবার উপায় নেই, সমস্তটাই বৃষ্টির সাদা আবরণে একাকার।

বাসটা স্টপেজে থামা মাত্রই প্রসাদ লাফিয়ে নেমে সুজয় ঘোষের মিষ্টির দোকানে ঢুকে পড়ে। এই টুকুতেই সে ভিজে যায় যথেষ্ট। বাসে দেখা যায় নি, কিন্তু তার নীল ফতুয়ার তলায়, কোমরে, বাঁধা ছিল একটা গামছা। প্রসাদ সেই গামছায় মাথা মোছে। সুজয় প্রশ্ন করে,

—এই দুর্যোগে তুই আবার কোথাকে গেছলু রে ?

প্রসাদ বেঞ্চে বসে গামছাটা ভিজে নীল ফতুয়ার উপরও বুলিয়ে নেয় আলতোভাবে।

—আর বোলো নি। উলবেড়ে যেতে হয়েছিল ভায়রা ভায়ের এই-যায় সেই-যাই অবোস্তার খবর শুনে। ই শালার ঝড়-বৃষ্টি তো বাড়ল আরো গো! সাইকুলোন মনে হয় যে! হ্যাঁ গা, উনুন নিবি দিয়েছ নাকি ? এক কাপ খেতে পারলে হতো।

চা খাওয়া শেষ করেই প্রসাদ উঠে দাঁড়ায়। যেন পরামর্শ চাইছে এমনিভাবে সুজয়কে বলে,

—বসে থেকে লাভ হবে কি কিছু ? এখনই যাই আর তখনই যাই, ভিজতে তো হবেই, কি বলো ? বেরি পড়াই ভাল, কি বলো ?

গামছাকে মাথায় পাগড়ির মতো বেঁধে প্রসাদ বৃষ্টির ভিতরে নেমে যায়। কিন্তু দুপা গিয়েই সে টের পায় বাতাসের তোড়। ঠেলে এগোনা অসম্ভব। তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ে পাশের ওষুধের দোকানে। দোকানে পা দিয়েই শুনতে পায় মহসিনের গলা।

—এই তো, আপনাদের দিকে যাবার লোক একজনা।

ঘুরে তাকিয়েই প্রসাদ দেখতে পায় রাণীদের।

—তুই বাড়ি যাবি তো প্রসাদ, নাকি রে!

—তা তো যাবোই। না গ্যালে কি তুমি খেতে দিবে ? খেতে দাও তো থেকে যাই।

মাথার ভিজে গামছাটা নিংড়োতে নিংড়োতে প্রসাদ বলে এক গাল হাসিতে। মহসিনও কম রসিক নয়।

—কি খাবি খা না। এত ওষুধপত্র, খাবার আবার অভাব ? আরে এনারা তো খুব বিপদে পড়েছেন। যাবেন সেই…

—আগো তমাকে বলতে হবে নি। ওনাদের আমি চিনি। যাবেন কি করে সেটা তো খুব ভাবনার কথা গো।

এবার সরাসরি রাণীর স্বামীর দিকে

—ই যা বিষ্টি আর বাতাসের তোড়, এখন তো রাস্তায় পা রাখতেই পারবেন নি। তারপর বড় রাস্তায় তো যাওয়া যাবে নি এগদম। যেতে হবে আপনাদের খালপাড়ের ঘুর রাস্তা ধরে।

দোকানের বেঞ্চের উপরে খোলা হয়েছে ভি. আই. পি. সুটকেশটা তোয়ালে বার করে মোছামুছির জন্যে। মাথা মুছতে মুছতেই রাণীর স্বামী,

—কেন, বড় রাস্তায় কি ?

—এক হাঁটু দ। মোদের ওভ্যেস হয়ে গেছে। ঠেলে-ঠুলে যাই। কিন্তু আপনারা এক পা যেতে পারবেন নি। তার উপর এই দুয্যোগে। কি বলো ? পারবেন কখনো ?

মহসিনও সমর্থন জানায়। মহসিন প্রসাদকে চেনে, এবং মহসিনের কথায় প্রসাদ সম্পর্কে কোনোরকম বাঁকা-ট্যারা ইঙ্গিত না পেয়ে কিছুটা আস্থার ভাব ফিরে আসে সৌমেনের অর্থাৎ রাণীর স্বামীর ভিতরে।

—খাল পাড়ের রাস্তাটা কেমন ?

—রাস্তা খুম ভালো নয়। কিন্তু যাবা যাবে। ইও খারাপ, উও খারাপ। তবে ওর মধ্যে খালপাড়টাই ভালো।

এই সময়ে ডালিম পরপর তিনবার হাঁচে। হলুদ তোয়ালেটাকে ঘাড়ের পিছনে চুলে জড়িয়ে চুল মুছতে মুছতে রাণী বলে,

—দেখেছো, যে ভয় করেছিলাম। কিছু একটা খাওয়াও ওকে।

সৌমেন সিগারেট ধরায়। লাইটার নিভিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে মহসিনকে

—সর্দির প্রিভেনটিভ কিছু আছে-টাছে আপনার এখানে ?

—তা আছে। কি নেবেন বলুন। ক্রোসিন, কোল্ডারিন !

—ক্রোসিনই দিন।

সৌমেন রাণীর দিকে ঘুরে।

—একটা গোটা স্ট্রিপ নিয়ে রাখি, আমাদেরও তো লাগবে মনে হচ্ছে।

রাণী তখন সুটকেশ এবং নিজেকে নিয়ে বিব্রত। নানারকম ইচ্ছে-অনিচ্ছে, হ্যাঁ-না, তাকে দোলাচ্ছে একই সঙ্গে। নাবালকের হাঁটা এবং আছাড় খাওয়া, আছাড় খাওয়া আবার হাঁটার মতোই তার ভাববার ভঙ্গি। যেমন যে ব্লাউজটা ভিজে গেছে সেটা ছেড়ে অন্য একটা ব্লাউজ পরার ইচ্ছেয়, সাদাসিধের মধ্যে কোন ব্লাউজটা এই পরা শাড়ির সঙ্গে মানাবে তা ঘেঁটেঘুঁটে বেছে নিয়েও পরক্ষণে তার দমে যাওয়া। কেন পাল্টাচ্ছি মিছেমিছি? যেটা পরবো সেটাই তো ভিজবে।

রাণীর কাছ থেকে শুধু মাথা নাড়া পেয়ে সৌমেন মহসিনকে,

—হ্যাঁ, একটা স্ট্রিপই দিন। ভালো ন্যাজাল ড্রপ আছে?

আবার রাণীর দিকে ঘুরে

—একটা ন্যাজাল ড্রপও নিয়ে রাখা ভালো, কি বলো?

রাণী পুনরায় ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ জানায়।

কি যেন খুঁজে চলেছে সে, পাচ্ছে না। রাণীর মুখের যে কোনো অভিব্যক্তিরই গূঢ় অর্থ সৌমেনের জানা। কিন্তু এখন এই ভীষণ বৃষ্টিপাত আর ঝোড়ো হাওয়ার বিপন্নতার ভিতরে সুটকেশটাকে খুলে রেখে রাণীর অবিরল ঘাঁটাঘাঁটির কোনো অর্থ খুঁজে পায় না সে।

—কি খুঁজছো?

—নাইটিটা দেখতে পাচ্ছি না কেন বলতো? যেটা প্যারিসে কেনা।

—এনেছিলে তো? ভেবে দ্যাখো।

—বেশ মনে আছে তলার দিকে রেখেছিলুম।

—এখন অত ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না। ওখানে গিয়ে ধীরে সুস্থে দেখো নিশ্চয় আছে। এনেছ যখন, যাবে কোথায়?

ডালিম এই সময়—মা! আমার সেই ম্যাক্‌সিটা—

এইটুকু বলেই আবার সে পর পর তিনবার হাঁচে। প্লাস-টিকের খাপে অনেকগুলো রঙীন রুমাল। প্রসাদের মনে হয় যেন এক গুচ্ছ রঙীন প্রজাপতি। তারই একটা বের করে রাণী ডালিমকে—এটা রাখো। নাকটা মুছে নাও।

ডালিম নাক মুছতে মুছতে—আমার সেই ম্যাক্‌সিটা? সুনীল আংকল যেটা পাঠিয়েছিল ন্যুইয়র্ক থেকে?

—এনেছি।

প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময়ই সে সুটকেশটা খুলে রাখে, যাতে প্রসাদ এবং মহসীন দেখতে পায় তার ঐশ্বর্য। দেখে বুঝতে পারে, তারা কোন্‌ শ্রেণীর। বিপদে পড়ে ভিড়ের বাসে রসুনগন্ধে ম-ম-করা একজন গেঁয়ো মেয়ের গা ঘেঁষে এসেছে বলেই সে ঐ স্তরের মেয়ে হয়ে যায় নি। প্যারিস বা ন্যুইয়র্কের নাম দুটো শুনেও যে প্রসাদ বা মহসীনের চোখের রঙে এতটুকু পরিবর্তন ঘটে না, তাতে অবশ্য খানিকটা বিমর্ষ বোধ করে রাণী। কী মূর্খ এরা সত্যিই। তবুও প্রসাদ যাতে তাকে সমীহ করে, সমীহ করার জন্যেই, প্রসাদকে ভালো করে দেখিয়ে দেওয়া দরকার তার আসবাব পত্র।

—আমরা যাকে পুঁটুর মা বলে ডাকতুম, আপনি কি তাঁর ছেলে?

প্রসাদ তাকিয়েছিল আকাশে, মেঘের রঙ বদলের দিকে। মনে হচ্ছে মেঘটা কাটবে কাটবে। কেননা হাওয়া আছে দুরন্ত। তবে কাটতে কাটতে গড়িয়ে যাবে বিকেল। মেঘ-বৃষ্টির গতিবিধির হিসেব-নিকেশটা চাষী-ভূষি মানুষের প্রায় রক্তের মধ্যেই। জোয়ারের সময় এলে মেঘ-বৃষ্টির দাপটটা বাড়বে। আজকের জোয়ারের সময়টা কখন সেটাই মনে মনে হিসেব করছিল প্রসাদ আকাশের দিকে তাকিয়ে। রাণীর প্রশ্নে ঘুরে তাকায়।

—পুঁটি ছিল মোর ছোটবোন। এতক্ষণে তাহলে চিনতে পেরেছ দেখতেছি। ত আমাকে আবার আপনি বলা কেন? ছেলে বেলায় কত খেলা-ধুলো করেছি, সোনালী-পোকা ধরেছি একসঙ্গে, সাঁতার কেটেছি তমাদের পুকুরে, সে সব কি আর মনে আছে এখন? থাকার কথাও নয়। বয়স তো কম হল নি। তিন ছেলেমেয়ের বাপ হয়ে গেছি। তা তোমার কি এই একটিই মেয়ে না আরো ছেলে পুলে আছে?

প্রসাদের শেষ প্রশ্নে যেন জ্বলন্ত লোহার ছেঁকা। হাপর থেকে তোলা লাল লোহা জলে ডোবালে যেমন মুহূর্তে কালো, তেমনি কালো হয়ে যায় রাণীর মনের ভিতরটা। এতক্ষণ ধরে ভি, আই পি সুটকেশটা খুলে রেখে নিজের ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের বিজ্ঞাপন দেখিয়ে মনের মধ্যে যেটুকু গর্বিত অহঙ্কারের স্বাদ ফিরে পেয়েছিল সে, ধসে যায় মুহূর্তে। রাণীর মনে হয়, লেক টেম্পলের তিনতলা বাড়ির সিংহাসন থেকে তাকে ছেলে-বিয়োনে-চাষীর ঘরের বৌ-এর পর্যায়ে টেনে আনার জন্যেই প্রসাদের ঐ প্রশ্ন। সঙ্গে নাইট থাকলে, নাইট তার অ্যালশেশিয়ান, এখুনি চিৎকার করে 'চার্জ' বলে উঠতে পারলে হাড়-মাংসের জ্বালা জুড়োতো রাণীর।

লম্বা সীট থেকে ডালিমের জন্যে একটা ট্যাবলেট ছিঁড়ে নিয়ে সৌমেন মহসীনের দিকে ঘোরে।

—একটু জল পেলে···

বিব্রত বোধটাই মহসীনের মুখে এঁকে দেয় সলজ্জ হাসি।

—জল আছে। কিন্তু···এ গেলাসে খেতে পারবেন কি?

—ভাঙা?

—ভাঙ্গা নয়, তবে-এ-এ···

সৌমেন ভেবেছিল কাঁচের গ্লাস। ময়লা মনে হলে ধুয়ে নেবে। কিন্তু মহসীন যে গ্লাসে জল দেয়, সেটা অ্যালুমিনিয়মের,

তোবড়ানো এবং ভাঁজে ভাঁজে শ্যাওলার মতো এঁটে থাকা ময়লা। সৌজন্যবশত সৌমেন সেটা হাতে নিয়ে এগিয়ে দেয় ডালিমের দিকে।

—খেতে পারবে?

ডালিমের মুখে বমি করার মতো আওয়াজ।

—না, এ জল আমি খাবো না।

ডালিমের হাতের ঝট্‌কা লাগে গেলাসে। খানিকটা জল উছলে পড়ে রাণীর খোলা সুটকেশে একটা জাপানি জর্জেটের উপর। রাণী শাসনের ভঙ্গিতে

—ও রকম করছো কেন? খাবে না তো খাবে না। ফেলছো কেন?

মহসীন প্রসাদকে ডাকে।

—দ্যাখ না ভাই, মিষ্টির দোকান থেকে একটা গ্লাস পাও কিনা।

এর পর সৌমেনের দিকে হাত বাড়িয়ে

—দিন, ওটা খেতে হবে না।

সমবেদনায় প্রসাদ ডালিমের পক্ষ নেয়।

—তোমাকেও বলিহারী। এতবড় দুকান ফেঁদে বসেছ। একটা ভালো গেলাস রাখতে পারনি? ওঁদের কখনো উ রকম গেলাসে খাবার ওভ্যেস আছে যে খাবে? মোরই তো গা ঘিনঘিন করতেছিল তমার গেলাসের বাহার দেখে।

পর পর ডালিম, রাণী, সৌমেন এবং মহসীনের উপর তার বক্তব্য এবং হাসিটাকে সমান ভাগ করে দিয়ে প্রসাদ একহাতে দোকানের ছিটেবেড়ার দেওয়ালকে ধরে শরীরটাকে খানিকটা বাইরে হেলিয়ে হাঁক দেয়—ও সুজয়দা, হাত বাড়িয়ে এক গেলাস জল দাও দিক্‌নি।

জলের গ্লাস চাওয়া এবং সুজয়ের হাত থেকে সেটা নেয়ার ফাঁকে আকাশ এবং বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে নেয় সে।

—নাগো, বিষ্টিদেবতার খানিকটে কৃপা হয়েছে মনে হচ্ছে। ধরবার মুখে।

ডালিমের ওষুধ খাওয়া হয়ে গেলে প্রসাদ গ্লাসটা ফিরিয়ে দেয়। প্রসাদের আগের কথার সূত্র ধরেই সৌমেন প্রশ্ন করে—ধরবে মনে হচ্ছে ?

প্রসাদ আকাশের দিকে তাকিয়ে

—ধরবে মনে হচ্ছে। তবে একবারে ধরবে নি। বাতাসের মতি-গতি তো যেই কে সেই। মা দুগ্‌গা মোদের পশ্চিম বাংলার উপর খুব চটে আছেন মনে হচ্ছে। গত বছরেও পুজোর আগে এমনি ঝড় হল। আবার ইবারও।

নিজের মন্তব্যে সে নিজে হেসে নেয় এক ঝলক।

বৃষ্টিটা থেমে আসে। একেবারে থামে না। ঝিরঝির। বৃষ্টি থামার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন দোকানপাটে আশ্রয় নেওয়া মানুষজন বেরিয়ে আসে বাজারের রাস্তায়। জমা জলের উপর অজস্র পায়ের ছবাক্‌ ছবাক্‌ আর মানুষের নানান রকম সাড়ায়, একটু আগের মরা পরিবেশটা জ্যান্ত হয়ে ওঠে হঠাৎ। প্রসাদ ঘুরে তাকায় সৌমেনের দিকে,

—আর দেরী করবেন নি। আপনারা বেরি পড়ুন এই ফাঁকে। তবে-এ-এ···

প্রসাদ থেমে গিয়ে ওদের সুটকেশ ইত্যাদি জিনিসপত্রের দিকে তাকায়। যেন এসব তারই সম্পত্তি, এবং তাকেই সামলাতে হবে এই সব লটবহরের দায়, এই রকমই নিবিষ্ট তার তাকানো।

প্রসাদের মুখে সহানুভূতির ফিনফিনে আভায় সৌমেন কিছুটা সাহস পায়

—আপনি তো যাবেন বাড়ির দিকে ?

—যাবো নিতো কি ? এই ঝড়ে ঘর-দুয়োরের কী দশা হয়েছে কে জানে।

—তা আমাদের যদি একটু সাহায্য করেন, এভাবে জড়িয়ে পড়বো বুঝতে পারিনি তো!

মহসীন আসল বক্তব্যটা স্পষ্ট করে দেয় তৎক্ষণাৎ।

—যাচ্ছো যখন ওঁনাদের সঙ্গেই যাও না। সুটকেশটুকু নিলেও উপকার করা হবে। টাকা পয়সা নিবেখন বরং।

প্রসাদ এক মুখ হাসি ছুঁড়ে দেয় মহসীনের দিকে।

—টাকাপয়সার কথাটা তুললে যখন তখন তো যেতেই হয়।

ঐ একই ভরাট হাসিতে সৌমেনের দিকে ঘুরে,

—তো দর-দস্তুরটা করে নিই আগে।

—তুমি কি চাও বলো?

—একজন লোকে হবে নি বাবু। অন্য একজনকে জোগাড় করে আনতেছি। ইবার বলুন আপনি কি দিবেন?

—টাকা কুড়ি নিও, দুজনে!

—কুড়ি টাকা?

—তাহলে কত?

—আর একটু বেশি দিবেন নি? আর পাঁচটাকা বাড়ি দিন। থোক পঁচিশ।

সৌমেন রাজী হলে প্রসাদ চলে যায় দ্বিতীয় জনের সন্ধানে।

রাণীর মুখে অস্ত্রের ধার যেন।

—ভীষণ মতলববাজ। আমি প্রথম থেকেই বুঝেছি। এখন বুঝতে পারছো?

জলে নামার জন্যে প্যাণ্টের তলাটা গোটাচ্ছিল সৌমেন। সেই কুঁজো অবস্থাতেই রাণীর দিকে তাকায়।

—টাকার লোভেই ভালমানুষটি সেজে এঁটে ছিল আমাদের সঙ্গে।

—ঠিক আছে, ও নিয়ে ভেবো না। সব গুছিয়ে নাও।

জুতো-টুতো সব খুলে কাগজে মুড়ে বেতের ব্যাগে ভরে নিতে হবে। ডালু, মা, জুতো মোজা খুলে ফ্যালো।

মহসীনের দিকে ঘুরে

—ভাই, আপনার কাছে ওয়েস্ট কাগজপত্র হবে কিছু? পুরনো খবরের কাগজটাগজ?

মহসীন খবরের কাগজ রাখে না। তবে ওষুধের প্যাকেজ হিসেবে নানারকম কাগজ থাকে। তার থেকেই জুতো মোড়ার যোগ্য লম্বা-চওড়া কাগজ খুঁজতে থাকে সে।

—টাওয়েলটা বাইরে রাখলে কেন?

—ডালিমের মাথায় তো কিছু একটা দিতে হবে। ডালিমকে জুতো খুলতে বলছ কেন? নাক দিয়ে এখুনি জল পড়ছে। ও হাঁটবে কি করে?

—ও হ্যাঁ। তবে থাক, খোলার দরকার নেই।

॥ ৩ ॥

লোক পাওয়া সত্ত্বেও সমস্যা মেটাতে সময় লাগে বেশ। শেষপর্যন্ত মনোনীত হয় প্রসাদের যুক্তিটাই। বেঁচু নামের যে অল্পবয়সী ছেলেটিকে জোগাড় করে এনেছে প্রসাদ, সে ভি আই, পি সুটকেশ আর বেতের ব্যাগটা নিয়ে আগে এগিয়ে যাবে। আগে পেঁছে সে রাণীর বাড়িতে খবর দেবে, যাতে কয়েকটা ছাতা ইত্যাদি নিয়ে বাড়ির লোকজন চলে আসতে পারে। প্রসাদ ডালিমকে মাথায় নেবে এবং মাঝারী সুটকেশটা হাতে। বাকী দুটো হালকা ধরনের ব্যাগ সৌমেন। রাণী চেয়েছিল একটা কিছু নিতে, প্রসাদ বারণ করে। মেয়েমানুষের পক্ষে হাতে কিছু নিয়ে ঐ রাস্তায় যাওয়া সম্ভব নয়।

বেঁচুর মাথায় সুটকেশ তুলে দেওয়ার পরও রাণীর ভুরুতে একটা প্রশ্নচিহ্ন এঁটে থাকে।

—ঠিক রাস্তায় যাবে তো ? দুনিয়ার দামী জিনিস ওর মধ্যে।

প্রশ্নটা সৌমেনকে। কিন্তু শুনতে পেয়ে উত্তর দেয় প্রসাদ।

—উসব নিয়ে ভয় পাবার কুনু কারণ নেই। বেগড়বাঁই করলে মেরে হাড় গুঁড়ো হয়ে যাবে নি! তা ছাড়া উ সে রকম ছেলে নয়। মোদের গ্রামের ছেলে।

ডালিম কিছুতেই প্রসাদের কাঁধে উঠতে রাজী হয় না। মানুষের কাঁধে চাপার অভ্যেস বা অভিজ্ঞতা না থাকাটাই তার বড় কারণ। দ্বিতীয় কারণ যদি কাঁধ থেকে ফসকে পড়ে যায়। তৃতীয় কারণ এই রকম একটা চাষাড়ে লোকের কাঁধে চেপে তার শরীরকে ছুঁয়ে থাকার অনীহা।

সৌমেন এবং রাণী দুজনে অনেক বোঝাবার পর ডালিম কাঁদতে কাঁদতে রাজী হয়।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে দিয়েই যাত্রা শুরু।

বাতাসের ধাক্কার কষ্টটা বাদ দিলে মিনিট দশেক বেশ ভালোই, কেননা পিচের রাস্তা। তার পরেই ডানহাতি বাঁক। এবং খালের পাড়। প্রসাদ আগে আগে। সে বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে পড়ে।

—ইবার ডাইনে।

সৌমেন ও রাণী বাঁকের মুখে এসে থমকে দাঁড়ায়।

—এই রাস্তা নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। একটু সাবধানে যেতে হবে। এ ছাড়া তো আর কোনো রাস্তা নেই।

—সর্বনাশ! এতো বাবলা বন। গাছপালার ভিতর দিয়ে যাবো কি করে ?

—দূর থেকে দেখতেছেন বলে বন মনে হচ্ছে। গাছের ফাঁক দিয়ে দিয়ে যাওয়া যাবে। তবে সাবধানে যেতে হবে আর কি!

—এর চেয়ে তো কাদা রাস্তাই ভালো ছিল। সেটা রাস্তা। এটা তো রাস্তাই নয়।

প্রসাদ হাসে।

—এ তবু যেতে পারবেন। সে রাস্তার অবস্থা তো চোখে দেখেন নি। এক হাঁটু দ।

সৌমেন ও রাণী পরস্পরের দিকে তাকায়। একজন অপরের মুখে দেখতে চায় সাহসী প্রতিক্রিয়া। কিন্তু দুজনেই ভয়ার্ত এবং বিহ্বল। দুজনের চোখেই আকাশের ঘোলাটে শূন্যতা। মনোবলের জোগান দেয় প্রসাদ।

—আপনারা যদি বলেন থালে উ রাস্তাতেই চলুন। কিন্তু দেখবেন আবার ফিরে আসতে হবে। দশ পা এগোতে পারবেন নি। ইখেনে তো সুবিধে, গাছ ধরে পা সামলাতে পারবেন। তা ছাড়া খালের নিচের ঢাল দিয়েও যাওয়া যাবে, ঘাসে ঘাসে।

পিছোবার রাস্তা নেই বুঝতে পেরে ওরা এগোতে বাধ্য হয়।

প্রসাদ যায় আগে আগে। যেন একটা ঢেউ। মাথাটা উঠছে, নামছে, কখনো কোমর থেকে নুইয়ে অর্ধেক করে নিচ্ছে শরীরটাকে। ডালিম পা ছোঁড়ে পড়ে যাওয়ার কিংবা গাছের ডালে গা-হাত চিরে যাওয়ার ভয়ে। প্রসাদ সান্ত্বনা দেয়,

—এই তো এতটা এনু। নেগেছে কোথাও? থালে ভয় পাচ্ছ কেন?

ডালিমের ভয় ঘোচে না তবু। সে বারে বারেই পিছন ফিরে তাকায়। এবং মা বাবাকে ডাকে। দশহাত হেঁটেই ঘেমে উঠছে রাণী। কাদার চেয়ে বাতাসেই বেশী বিব্রত। বাবলার নুয়েপড়া সরু ডালগুলো বাতাসের ঝাপটায় যখন-তখন কাঁটা ফুটিয়ে চলছে তার হাতে পিঠে ঘাড়ে। চলতে চলতেই নানা রকম অভিযোগ তার।

—এই, আমি পা রাখতে পারছি না যে।

—এই, একটু দাঁড়াও। আমার শাড়ি আটকে গেছে। কি করে ছাড়াবো? বাঃবাঃ। এই দেখ, শাড়িটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। একটু এসো না।

—না সত্যিই পারবো না আমি। এভাবে মানুষ যেতে পারে? আমি পড়ে যাচ্চি ই-ই।

রাণীর অবিবেচনায়, বাস্তবকে না-বোঝার অক্ষমতায়, সৌমেন বিরক্ত। হাতের অ্যাটাচি মাটিতে নামিয়ে রেখে রাণীর শাড়ি থেকে, কখনো মাথার চুল থেকে আটকে যাওয়া বাবলার কাঁটা-বহুল ডাল সরাতে হয় তাকে। রাণীর মুখে দুর্যোগের জল-ছাপ। সে অধৈর্য।

—আমার কিন্তু ভয় করছে।

—কিসের ভয়?

—লোকটা ঠকিয়ে আমাদের ভুল রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে। তুমি দেখ যে-ছেলেটা সুটকেশ নিল, তার চিহ্ন নেই কোথাও।

—সে তো এ-রাস্তায় যাচ্ছে না। তাকে তো বড় রাস্তাতেই যেতে বলেছে, তাড়াতাড়ি পেঁছিবার জন্যে।

—সে যাই হোক, লোকটার কিছু একটা মতলব আছে।

—চুপ করো। বিপদে পড়েছি আমরাই। ওকে বিশ্বাস না করে উপায়ই বা কি?

ডালিমকে ভোলাবার জন্যে প্রসাদ গল্প জুড়ে দেয়। ডালিম তবুও অন্তরঙ্গ হতে পারে না। কারণ তার শিক্ষা অন্য রকম। তাদের বাড়িতে প্রসাদের মতো তিন চারটে চাকর। সেই চাকরেরা ডালিমকে পর্যন্ত ভয়-সমীহ এবং শ্রদ্ধা নিয়ে কথা বলে। ডালিমও আরেক গৃহকর্ত্রী তাদের কাছে।

—অমন নোড়ো না, তুমি নড়লে আমি পড়ে যাবো।

—তোমার কথা শুনবো না।

—কেন শুনবে না।

—তুমি বাজে লোক। তুমি মাথায় এত তেল মাখো কেন? তোমার জামায় বিচ্ছিরী গন্ধ।

বাঁধের রাস্তা থেকে এবার নিচে নামতে হবে। কারণ নিচে

অনেকখানি সমতল জায়গা, ঘাস আর সাধারণ গাছ-গাছড়ার জঙ্গলে ছাওয়া। নামার আগে প্রসাদ সৌমেনদের দিকে হাঁক দেয়।

—এইখেনে, ডানহাতি নামবেন।

বাতাসের তোড়ে প্রসাদের হাঁক ধানক্ষেতের উপর দিয়ে উড়ে যায় দূর-দূরান্তে। বুঝতে না পেরে সৌমেনের পাল্টা হাঁক,

—কি বলছো, বুঝতে পারছি না।

প্রসাদ আবার চেঁচায়। সৌমেনেরও পাল্টা চিৎকার। শেষপর্যন্ত প্রসাদের অঙ্গভঙ্গি থেকে বুঝে নেয় ব্যাপারটা। ওরা নিচে নামে। বাঁধ থেকে ঢালু হয়ে বেশ খানিকটা ঘাস ও ছোট গাছের জঙ্গলে ভরা সমতল। বাঁধ থেকে নিচে নেমে খানিকটা ভরসা পায় রাণী। কারণ বাতাসের ঠেলাটা অপেক্ষাকৃত কম। বাঁধের উপরে বাতাসের সাঁইসাঁই শব্দ আর বাবলা বনের মাতাল লুটোপাটির ভঙ্গিতে আতঙ্কের উপকরণ ছিল অনেক বেশী। অনেকক্ষণ নিঝুম হয়ে থাকার পর রাণী আবার ফুসফুসে জোর পায় কথা বলার মতো।

—কার মুখ দেখে উঠেছিলাম কে জানে।

সৌমেন নিজের কণ্ঠকে হালকা করার জন্যেই রসিকতা করে।

—কার আর দেখবে? তুমি আমার মুখ। আমি তোমার মুখ। এই তো!

—তুমি হাসছো? আমার শাড়িটার কি দশা হয়েছে দেখছো?

—আর একটু তুলে নাও।

—কত তুলবো আর? কোমরে তো তোলা যায় না!

পড়ে যাওয়ার ভয় কাটলেও ডালিম এখনো বিচলিত।

—মা কই? বাবা কই? দেখতে পাচ্ছি না কেন?

প্রসাদও থমকে দাঁড়িয়ে ঘোরে। সেও দেখতে পায় না রাণীদের। তবু বলে

—আছে আছে। ঐ তো আসতেছে।

—কই? না আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন?

ঢাকে যেভাবে কাঠি বাজে, সেই ভাবেই ডালিমের জুতো শুদ্ধ পা দুটো প্রসাদের বুকে আছড়ায়। প্রায় কাতরিয়ে ওঠার মতো যন্ত্রণায় প্রসাদ ডালিমকে ঘাড় থেকে নামাতে বাধ্য হয়।

—উঃ, কি করলে বলতো? ওরকম করে পা ছুঁড়লে পাঁজরা ভেঙে যাবে যে আমার।

—যাক্। আমার মা কই! বাবা কই?

ডালিমের শিশুকণ্ঠের আর্তনাদ এই মুহূর্তে ছোরার মতো ধারালো। তবে এই জাতীয় আর্তনাদের মর্মান্তিকতা মঞ্চের পক্ষেই যথোপযুক্ত। কারণ সেখানে তিনদিক ঘেরা। ফলে সরাসরি দর্শকের বুকে বিদ্ধ হওয়ার পক্ষে সে আর্তনাদ পেয়ে যায় একমুখো পথ। কিন্তু এখানে, এই প্রান্তরে, যার ঊর্ধ্বে দুঃস্বপ্নের মতো আকাশ, মাঝখানে প্রতিহিংসাপরায়ণ যুদ্ধযাত্রীর মতো বাতাস আর নিচে অস্ত্রাঘাতে অর্ধমৃতের মতো মাটি আর শস্যক্ষেত্র, যেখানে চারদিক উন্মুক্ত, বৃক্ষরাজিও আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষায় বিপন্ন, সেখানে এই আর্তনাদ বন্যাস্রোতে ম্রিয়মাণ বুদ্বুদ্। তবে এই আর্তনাদে চিড় ধরে প্রসাদের অভ্যন্তরে।

—তুমি ইখেনে একটু দাঁড়াও। আমি দেখে আসি।

ডালিম ডুকরে ওঠে সে প্রস্তাবে। প্রসাদ এক অদ্ভুত দোটানায় মাথার গামছাকে নিংড়ে গা-হাত মুখ মুছে আবার নিংড়িয়ে বাতাসে ভট্ ভাট্ ঝেড়ে সেটা মাথায় বাঁধে। ডালিমের হলুদ তোয়ালেটাও নিংড়ে দেয়। এই সময়ে আকাশকে দেখে নেয় তার চোখ। আকাশের ষড়যন্ত্র তার কাছে নতুন কোনো দৃশ্য বা ঘটনা নয়। সে কাতর এই শহুরে তিনটি প্রাণীর জন্য। দশদিক জুড়ে বিদ্যুৎ ঝিলিক। মেঘগর্জন অসম্ভব ভারী, জলের ভিতরে কামান দাগার মতো। প্রসাদ এই ফাঁকে আলগা হওয়া মালকোচাটা আরো খাটো করে নেয়।

—তুমি ডালুকে দেখতে পাচ্ছ?

—ওরা এগিয়ে গেছে।

—কত দূরে এগোবে যে দেখতে পাবো না। আমার ভীষণ ভয় করছে, সত্যি বলছি। কিছু একটা ঘটে গেলে তুমি তখনই না বললে পারতে, এই লোকটাকে অমন আমল দিতে গেলে কেন? আমি তো গোড়া থেকেই···

—তুমি মাঝে মাঝে 'রিজন' হারিয়ে ফেলো, এই তোমার এক দোষ।

—আমার যে কী কষ্ট হচ্ছে সে তুমি বুঝবে না।

—এ তো কেউ ইচ্ছে করে করি নি। ঘটনাচক্রে···

—কি করে হাঁটি বলতে পারো? সিল্কের শাড়ি, ভিজে গিয়ে পায়ে এঁটে যাচ্ছে।

—আরেকটু তুলে নাও।

—আর কত তুলবো? তাহলে তো 'নেকেড' হয়ে যেতে হয়।

—কেউ তো দেখছে না।

রাণী সত্যিই এখন এক বেঢপ আকৃতি। বৃষ্টির জলে ভিজে তার সাদা পাদুটো, যা হাঁটুর উপরেও অনেকখানি নগ্ন, আরও সাদা। কোমর এবং হাঁটুর মাঝামাঝি একটা জায়গায় দুহাতের বাঁধনে জমানো তলার শাড়ি। যেন ঐখান থেকে তার শরীরের শুরু, পুতুলনাচের পুতুলের মতো। পা দুটো পুতুল-ধরার লাঠি। ভিজে চুল লেপটে গেছে মাথায়, কানের দুপাশে, পিঠে ঘাড়ে। তার চশমা এখন সৌমেনের পকেটে। তাই আগের চেয়ে অনেক শীর্ণ ও লম্বা লাগছে তাকে। পালক ছাড়িয়ে নিলে যেমন দেখতে হয় হাঁস-মুরগী।

—ঐ তো তোমার বাবা আর মা

—কই, দেখতে পাচ্ছি না কেন?

প্রসাদ বগলে দুটো হাত দিয়ে শূন্যে তুলে ধরে ডালিমকে।

ডালিম দেখতে পায়। প্রসাদ এগোতে চায় এবার। ডালিম রাজী হয় না।

ডালিমকে দেখতে পেয়ে রাণীর শরীরে ফিরে আসে কিছুটা শান্তি এবং শক্তি। ওরা কাছাকাছি পৌঁছলে প্রসাদ বলে—একটু জোরে পা চালাতে হবে ইবার। জোর পশলা নামবে এখুনি। জুয়োরের সময় এগি আসতেছে তো।

—এর চেয়ে জোরে?

রাণীর উচ্চারণে হাঁপ। ডালিমের গলায় অভিযোগ,

—তোমরা এত পিছিয়ে থাকো কেন?

রাণী তার ঠাণ্ডা ঠোঁটে ডালিমের ঠাণ্ডা গালে চুমু খায়।

—কি করব মা, আমাদের কি 'হ্যাবিট' আছে এই রকম রাস্তায় হাঁটার?

—রাস্তা এ রকম কেন।

—এটা গ্রাম তো। গ্রামে এ রকম হয়।

—তুমি এমন 'ন্যাসটি' গ্রামে জন্মাতে গেলে কেন?

গ্রাম এবং রাণী দুজনের পক্ষেই ওকালতি করে প্রসাদ।

—আর বছর এসে দেখবে, কী রকম রাস্তা। নতুন রাস্তা তৈরী শুরু হয়ে গেছে। তখন আর হেঁটে যেতে হবে নি। সাইকেল রিকশায় একদম দরজা গোড়া পর্যন্ত।

রাণীর মুখে এই প্রথম হাসি দেখতে পায় প্রসাদ। রাণী সত্যিই সুন্দরী। তার হাসির মিষ্টতায় পিছনের সমগ্র অন্ধকার ও আক্রমণকারী নিসর্গ আরো বীভৎস হয়ে ওঠে। হাসির সঙ্গে সঙ্গে রাণীর মুখে জলের বিন্দুগুলো মুক্তোদানা হয়ে যায়।

তারা হাঁটার জন্যে প্রস্তুত হয় আবার। ডালিমকে কাঁধে তোলে প্রসাদ। কিছুটা এগোবার পরই বাঁধের নিচের ঢালু জায়গাটা শেষ। বাঁধে উঠতে হবে আবার। প্রসাদ উঠে যায়। রাণী ও সৌমেন উঠতে পারে না। পা রাখলেই পা পিছলে যায়। একবার

গড়িয়ে পড়ার অবস্থাও হয় রাণীর। সৌমেন জাপটে ধরে বাঁচায়। প্রসাদ নির্দেশ দেয়, কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে, ঘাসের চাপড়া-ওলা মাটির ডাঁই যেখানে, সেখানে দিয়ে উঠতে।

বাঁধে ওঠার একটু পরেই প্রবল বর্ষণ। বাতাস সহসা ঘুরে ওদের সামনে আসে, প্রতিপক্ষের মতো মুখোমুখি। এতক্ষণ ছিল পাশে। বাতাসে এখন ভিন্নরকম শব্দ, যেন চাকা ঘুরছে প্রকাণ্ড কোনো এঞ্জিনের। বৃষ্টির তীব্র ঝমঝমানির সঙ্গে মিশে গেছে বলেই বাতাসে এমন যান্ত্রিক ধ্বনি।

—এই, আমি দাঁড়াতে পারছি না।

বৃষ্টিতে মাত্র চার হাত দূরের সৌমেন এখন আবছা। বাতাসের তোড়ে রাণীর এই বিলাপ উল্টো দিকে ভেসে যায়। সৌমেন শুনতে পায় ক্ষীণতর আভাস শুধু।

—কি বলছো ?

—আমি যে দাঁড়াতে পারছি না একেবারে।

—বুঝতে পারছি না, কি বলছো ?

—তুমি কি বলছো, শুনতে পাচ্ছি না।

রাণী মাটিতে বসে পড়ে। এখন তাকে এগোতে হয় অনেকটা চতুষ্পদের ভঙ্গিতে। সৌমেনের ভঙ্গিটাও সেই রকমই। আর এই সময়ে ঠিক তাদের মাথার উপরেই বজ্রধ্বনি। রাণীর সর্বাঙ্গ মৃত্যুভয়ে কাঁটা। নেল-পালিশের লাল নখ দিয়ে, বন্য জন্তুর থাবার মতো, মাটি আঁকড়ে ধরে সে। বজ্রধ্বনির বিকটতায় কেঁদে ওঠে ডালিম। প্রসাদ তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে, দুহাতের মাঝখানে, কোলে নেয়। প্রসাদের ভঙ্গিতে অতি পুরনো পৌরাণিক বাসুদেব ও শ্রীকৃষ্ণের আদল ফুটে ওঠে। বাতাসের ঠেলায় প্রসাদের তাগড়াই শরীরটাও কুঁজো। আরো কিছুটা এগোবার পর প্রসাদের গলা চিরে এক ভীষণ উচ্চারণ।

—হায় আল্লা! বাঁধ কাটল কবে ?

ক্ষেতের ধান বাঁচাতে, ক্ষেতের জল খালে পাঠানোর জন্যে দু-একদিনের মধ্যেই বাঁধটা কাটা হয়েছে। তারপর বৃষ্টি থামে নি। ক্ষেতের জল বেড়েই চলেছে। সেইজল এখন প্রবল টানে খালের দিকে। ডালিমকে না হয় পার করিয়ে দিতে পারবে সে, বাঁধ থেকে ধানের ক্ষেতে নেমে, ক্ষেতের জল ভেঙে। কিন্তু বাকী দুজন?

ডালিম সমস্যাটা বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করে

—এবার কি নৌকোয় চাপতে হবে নাকি?

—না মা। তুমি দাঁড়াও।

বৃষ্টিটা ঈষৎ পাতলা হয়ে আসছিল ক্রমশ। ডালিম এবং হাতের ব্যাগ নামিয়ে ডালিমের হলুদ তোয়ালেটা নিংড়ে মুখ, মাথা ও হাত-পা মুছিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে প্রসাদ সম্পর্কে তার মনের বিরূপতা কেটে গেছে অনেকটা। মুখ মাথা মোছার পর আবার তোয়ালেটা নিংড়ে মাথায় চাপিয়ে দেবার মুহূর্তেই সৌমেনের আর্ত হাঁক শুনতে পায় সে। প্রসাদ ঘুরে দেখতে পায় অনেকটা দূরে রাণী মাটিতে উপুড়। ডালিম কেঁদে ওঠে

—মা পড়ে গেছে এ-এ।

প্রসাদ দ্রুত এগিয়ে যায় সৌমেনের কাছে। সৌমেন উঠে দাঁড়িয়েছে। হাতদুটো ছড়ানো এবং কাদায় লিপ্ত। হাতের অ্যাটাচি ও অন্য একটা ব্যাগ মাটিতে। সেসবও কাদাময়। সৌমেন বলে,

—ওকে একটু ধরো ভাই। ও আর পারছে না।

প্রসাদ রাণীর দিকে এগিয়ে যায়।

—আমি বুঝতে পারতেছি খুব কষ্ট হতেছে। কার্পেটে পা দিয়ে হাঁটা ওভ্যেস তমাদের। ই ধরনের কষ্ট সহ্য হয় কখনো? খুব শক্ত করে ধরো দিকনি মোর হাতদুটো। হ্যাঁ, ভয় নেই। আর কিছু হবে নি। শুদু পায়ের আঙুল দিয়ে মাটিটা কামড়ে ধরতে হবে। . আলগা হলেই পিছলোবে। ই সময়টায় আসা উচিত হয়

নি। জেঠিমাদের উচিত ছিল, চিঠি দিয়ে বারণ করা। ওবিশ্যি তেনারাই বা বুঝবেন কি করে, দুর্যোগটা দিনকে দিন বেড়ে যাবে এত।

রাণী কোনো কথা বলে না। যতই উপকারী হোক, একজন গ্রাম্য চাষার কাছে এই পরাভবের লজ্জা তার মধ্যে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ফাঁপিয়ে তোলে। যেন রাণীর অহঙ্কার চৌচির করার জন্যেই প্রসাদ ভুল রাস্তায় নিয়ে এসেছে তাদের, এই ধারণা থেকেই প্রসাদের বিরুদ্ধে তার মন-মেজাজ ক্ষিপ্ত।

—কাটা বাঁধের কাছে এসে সৌমেনের গলায় বন্দুকের মতো আওয়াজ।

—একি কাণ্ড!

রাণীকে ধরে প্রসাদ কাছে এসে সান্ত্বনা দেয়!

—বেশী জল নেই। আমি পার করে দুবো। ভাববেন নি।

ডালিমকে বুকের কাছে নিয়ে ধান ক্ষেতের ভিতরে নেমে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে সে যখন ওপারে গিয়ে ডালিমকে নামায়, বুকে একটু সাহস পায় সৌমেন। সৌমেনকে সে পার করায় হাত ধরে হাঁটিয়ে। সৌমেন আর প্যাণ্ট গোটায় না। জল তার কোমর পর্যন্ত। সমস্যা বাধে রাণীকে নিয়ে। রাণীর মধ্যে নানান ভয় ও উদ্বেগ। জলে যদি সাপ থাকে? যদি পড়ে গিয়ে জলে ডুবে যায়? জলের শামুকে পা কাটে যদি? প্রসাদ হেসে সাহস জোগায়।

—ঐ তো উনি পার হয়ে গেলেন গো। ওনার কি কিছু হয়েছে?

প্রসাদের হাত ধরে অনেক কষ্টে বাঁধের নিচে ধানক্ষেতের পাড় পর্যন্ত এসে রাণীর মুখটা ফ্যাকাসে। বিস্তীর্ণ জলরাশির দিকে তাকিয়েই সে আধ-মরা।

—তাহলে ? তাহলে তো আমার কাঁধে উঠতে হয়। পারবে ? শক্ত করে আমার গলাটা আর কোমরটা জড়িয়ে ধরতে হবে। পারবে নি। খুব পারবে।

সৌমেন বাঁধের ওপার থেকে রাজী হতে বলে। রাণীর শেষ গুমোরটুকুও এইভাবে চূর্ণবিচূর্ণ।

রাণীকে পিঠে নিয়ে জলে নামে প্রসাদ। এগোতে এগোতে জল বাড়ে। প্রসাদের কোমর ডুবে যায়। ডুবে যায় প্রসাদের কোমর জড়ানো রাণীর পা-দুটোও। জলে পা ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাণী কেঁপে ওঠে। ভয়ে আলগা হয়ে যায় তার পা দুটো। প্রসাদ টাল সামলাতে পারে না। রাণীর শরীরটা তখন প্রসাদের পিঠে ঝুলে প্রসাদকেই টেনে নিতে চাইছে জলের ভিতরে। ভয়ংকর শাসন গর্জে ওঠে প্রসাদের চাষাড়ে কণ্ঠস্বরে।

—অমন করলে তলি যাবে দুজনেই জলে টান আছে।

বাঁধের ওপরে থেকে সৌমেনের চিৎকার, ডালিমের কান্না।

রাণী তবুও নিজেকে সামলাতে পারে না। প্রসাদের পিঠ বেয়ে ঝুলে পড়ে তার শরীরটা। এবং জলের টানে তার পা দুটো বাঁকতে থাকে। সাংঘাতিক বিপদের মুখোমুখি পেঁছে প্রসাদ ভেবে নেয় তার কর্তব্য। সাঁ করে এক ঝটকায় নিজের শরীরটাকে ঘুরিয়ে নেয় উল্টো দিকে। ঘুরিয়ে নিয়েই কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়ে জলের উপর। আচমকা ধাক্কায় রাণীর হাতদুটো খসে পড়েছে তার কাঁধ থেকে। রাণীর সম্পূর্ণ শরীর জলে। রাণীর গলায় মৃত্যুআর্তনাদ। আর তখনই জলের তলা থেকে প্রসাদের দুটো হাত রাণীর হাঁটু এবং ঘাড়টাকে তুলে ধরে জলের উপর। বাঁচার আকাঙ্ক্ষায় রাণীর ব্যাকুলতা এখন এমন তীব্র যে, প্রসাদকে আর অস্পৃশ্য চাষার ছেলে মনে হয় না তার, মনে হয় না সে অচেনা এবং ষড়যন্ত্রকারী। প্রসাদ বাল্যকালের বন্ধু, প্রসাদ সাহসী, প্রসাদ পরোপকারী, প্রসাদ পরিত্রাতা এই জাতীয় শুভবোধ থেকেই সে

প্রসাদের গলাটাকে জড়িয়ে ধরে দুহাতে, নিজের ভেঙে পড়া মূর্তিটাকে সামলাতে। প্রসাদের চিবুকের নিচে তার মাথা। তার স্তন প্রসাদের বুকে পিষ্ট। তার জঙ্ঘা ধাক্কা খায় প্রসাদের হাঁটুর ওঠা নামায়। প্রসাদের মাথার, মুখের গড়ানো জল রাণীর মাথায়, মুখে, চোখের পল্লবে, ঠোঁটে, চিবুকে, সর্বত্র। শক্ত গাছের গায়ে স্বর্ণলতিকার বেড়ের মতোই রাণী এখন প্রসাদকে সর্বাঙ্গ দিয়ে জড়িয়ে। আত্মসমর্পণে।

প্রসাদ জল থেকে স্থলের দিকে।

॥ ৪ ॥

—জেঠিমা, তাহলে তমাদের মেয়ে-জামাইকে পেঁছে দিনু। কী যে কষ্ট হয়েছে এনাদের, সে ঈশ্বর জানেন। তমার মেয়েতো পেত্থমে মোকে চিনতেই পারে নি। ভেবেছে কোথাকার কে। সে বেঁচু ছোঁড়াটা বড় সুটকেশটা নিয়ে পেঁচেছে তো? সে কি? এখনো পেঁছলনি? জানো জেঠিমা তমার জামাই আবার মোকে টাকা দেখাচ্ছিল। আমিও মস্করা করে দর বাড়াচ্ছিনু…।

জেঠাইমাকে চোখে দেখা যায় না, মেয়ে জামাই নাতনীকে পেয়ে তিনি ভিতরে। তবে ঘরের ভিতর থেকেই ভেসে আসে তাঁর স্নেহপরায়ণ কণ্ঠস্বর।

—তুই যেন চলে যাসনি পেসাদ। এখানে খেয়ে দেয়ে তবে যাবি।

বৃষ্টির ধারার মতোই হাসি গড়ায় প্রসাদের মুখে।

—খেয়ে তো যাবোই গো। মেয়ে-জামাইয়ের জন্যে ভালো-মন্দো রান্না একটু তো চাখবোই।

প্রসাদ উঠোন থেকে ঘাটে চলে আসে। হাত-পায়ের কাদা সে নিজে ধোয়। আর রাণী এবং ডালিমের পা থেকে যে কাদা লেগেছে তার জামা-কাপড়ে, সেসব ধোয়াতে থাকে দুর্যোগের আকাশ থেকে নামা নির্ঝর।

———